সপ্তম অধ্যায়

আধুনিক বাংলা উপন্যাসে মনসা-কথার নবনির্মাণ

বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় উপন্যাস আধুনিকতম সাহিত্য সংরূপ। তবে চর্যাপদ থেকে শুরু করে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘ যে পথ পরিক্রমণ, তার মধ্যেও যে উপন্যাসের বীজ লুকিয়ে ছিল না একথা জোর গলায় বলা যেতে পারে না। শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে—

> ''এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই।।''[১]

মুকুন্দরাম শুধু সময়ের প্রভাব অতিক্রম করতে, অতীত সাহিত্য রচনার প্রথা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং আলৌকিকতা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেননি বলে খাঁটি ঔপন্যাসিক হতে পারেননি। তারপর বাংলা ভাষায় এই আধুনিক সাহিত্য সংরূপ উপন্যাসের পুরোপুরি যাত্রা আরম্ভ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরেই সার্থক বাংলা উপন্যাসের সূচনা। প্রাক্ স্বাধীনতা মুহূর্তের রাজনৈতিক হিন্দু-মুসলমান বিরোধী সাম্প্রদায়িক বিভেদ, দাঙ্গা, পারস্পরিক অবিশ্বাস ইত্যাদি রক্তক্ষয়ী ইতিহাস উপন্যাসের মধ্যে উঠে আসে। তবে কিছু ঔপন্যাসিক উদার মানবিক বোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে, সাম্প্রদায়িক তিক্ততা ভুলে মানুষের মনুষ্যত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সামাজিক বিষয়কে কেন্দ্র করে এই ধারার পাশে আরও একটি ধারা বাংলা উপন্যাসে সচল ছিল তা হল— মনন-চিন্তা প্রধান বিতর্কমূলক ভাবনাকেন্দ্রিক উপন্যাসের। এ জাতীয় উপন্যাসের লেখকরা মানুষের মনের ভিতরের আত্মসমীক্ষা কিংবা ইতিহাস বা মিথ থেকে কোনো একটি তত্ত্ব বিষয়কে তুলে ব্যক্তি কেন্দ্রিক বা আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে তার পুনর্মূল্যায়ণে নতুন মাত্রা দান করেন। উপন্যাসে উঠে এসেছে মানুষের মনের অন্তঃকোণে পাপবোধ, স্বীকারোক্তি, ডিটেকশন, কনফেশান প্রভৃতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মনঃসমীক্ষামূলক ঘটনার বিকৃতি। সেই সঙ্গে সমাজ বা কালের সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্বের রূপায়ণের দিকটিও গুরুত্ব দিয়েছেন। স্বাধীনোত্তর বিশ শতকের বাংলা উপন্যাসে শুধু চরিত্রই প্রাধান্য পেতে থাকে না, চরিত্রের অন্তর্ঘন রহস্য বা মানুষের মনের বাস্তবতা, জটিলতাকে তুলে ধরেছেন। পরপর দুটি মহাযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা, দেশভাগ, তজ্জনিত নানা ঘটনার উত্তাল তরঙ্গ সমাজের চেহারাটাকেই বদলে দিল এমন আমল যে,

সেই পরিবর্তিত দিনের কথা ও রূপ ধরে রাখার জন্য কথা সাহিত্যের ভাষায় তৈরি হল নতুন ডিসকোর্স। জন্ম নিল নতুন প্রজন্মের লেখক। যাঁদের লেখায় আধুনিক জটিল সমাজের বহুরূপ ও বহু অনুভব সক্রিয় হয়ে উঠেছে। উঠে এসেছে আধুনিক ব্যক্তি মানুষের দুর্বোধ্য জটিল মন ও মানুষের জীবনযন্ত্রণার রূপ। এই উপন্যাসগুলিতে মানুষের সংকট অন্ততপক্ষে দুটি স্তরে চিহ্নিত— একটি সমাজ পরিস্থিতি জনিত অসঙ্গতি, অন্যটি হল আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনিশ্চয়তা। পুরাতন ঐতিহ্যের দিকে হাত বাড়িয়ে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে ব্যক্তিমনের প্রতিটি স্তরের, প্রতিটি বিভঙ্গের সচেতন বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলা উপন্যাস নিয়ে আসে এক ভিন্নস্রোতের ঢেউ। বিশ শতকের শেষার্ধ থেকে আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসাকে তুলে ধরার জন্য এই ঔপন্যাসিকগণ হাত বাড়িয়েছেন বাঙালির ঐতিহ্যের দিকে। মিথ তথা পুরাণ কাহিনীকে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিতে দাঁড় করিয়েছেন। এই সময় আমরা চর্যাপদকে কেন্দ্র করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে' (১৯১৯), দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চর্যাপদের হরিণী' (১৯৫৯), সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন' (১৯৮৫), শিবাশিস মুখোপাধ্যায়ের 'কাহ্ন' (২০১০) উপন্যাস; শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাধাকৃষ্ণ' (১৯৭৬), দীপক চন্দ্রের 'মন বৃন্দাবন' (১৯৩৩), ও 'যদি রাধা না হত' (১৯৯৫) উপন্যাসে রচিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যকে নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অমাবস্যার গান' (১৯৭১), সেলিনা হোসেনের 'চাঁদবেনে' (১৯৮৮), অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'চাঁদবেনে' (১৯৯৩), অভিজিৎ সেনের 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' (১৯৯৫), সত্যপ্রিয় ঘোষের 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' (১৯৯৯), শচীন দাসের 'নদীতরঙ্গের আয়না' (২০০৯), মহাশ্বেতা দেবীর 'ব্যাধখণ্ড' (১৯৬৪), 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৭), 'বেনেবউ' (১৯৯৪), রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধনপতির সিংহল যাত্রা' (২০০৭) প্রভৃতি উপন্যাস। বর্তমান অধ্যায়ে আমি মনসামঙ্গল কাব্যের মনসাকথার মিথকে নিয়ে লেখা যে চারটি উপন্যাস নিয়েছি। সেগুলি হল—

১. চাঁদবেনে (১৯৮৪) — সেলিনা হোসেন

২. চঁদেবেনে (১৯৯৩)— অমিয়ভূষণ মজুমদার

৩. বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর (১৯৯৫) — অভিজিৎ সেন

৪. স্বপ্নের ফেরিওয়ালা (১৯৯৯) — সত্যপ্রিয় ঘোষ

লেখকের নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে এক একটি উপন্যাসে কীভাবে আধুনিক মঙ্গলকাব্য হয়ে উঠে এসেছে, তা নিম্নে আলোচনা করব।

মনসামঙ্গলের বিষয় নিয়ে অর্থাৎ দেবী মনসা ও চাঁদ সদাগরের কাহিনি নিয়ে উপন্যাস রচনায় কলম ধরেন বাংলাদেশের স্বনামধন্যা লেখিকা **সেলিনা হেসেন**। ১৯৮৪ সালে তাঁর **'চাঁদ বেনে'** উপন্যাসটি প্রকাশ পায়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না লেখিকা সেলিনা হোসেনের (জন্ম ১৯৪৭-এর ১৪ই জুন, অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী শহর। তাঁর লেখার জগৎ বাংলাদেশের মানুষ, তার সংস্কৃতি, ও ঐতিহ্য। বাংলার লোকপুরাণের উজ্জ্বল চরিত্রগুলি নতুনভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাসে। প্রতিফলিত হয়েছে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সংকট। সেই সঙ্গে ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ তাঁর রচনাকে নতুন মাত্রা দান করেছে। রাজনৈতিক বাতাবরণকে তাঁর রচনার অন্যতম দিক বলে মনে করেন। তাই এক সাক্ষাৎকারে তিনি মন্তব্য করেছেন— "I love that my story may turn into a political idea."[২] তাঁর লেখা ৩২টির বেশি উপন্যাস আমরা পেয়ে থাকি এবং এখনও লিখে চলেছেন তাঁর সুচারু লেখনী দ্বারা। উপন্যাস রচনা ছাড়া ৪টি ছোটগল্প সংকলন, বেশ কয়েকটি শিশু সাহিত্য ও প্রবন্ধাবলী রচনা করেছেন। ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা, ফ্রেঞ্চ, রুশিয়ান, ইংরেজি প্রভৃতি বহু ভাষায় অনূদিত হয় তাঁর উপন্যাস। কর্মসূত্রে শিক্ষিকা এই লেখিকা বর্তমানে National Human Right Commission of Banghladesh-এর মেম্বার এবং Excutive Board of UNESCO-এর representative হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। নিম্নে তাঁর রচনাগুলি ধারাবাহিক ভাবে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি—

১. 'জ্যোৎস্নায় সূর্য জ্বালা' (১৯৭৩ খ্রী.)

২. জলোচ্ছ্বাস' (১৯৭২ খ্রী.)

৩. 'হাঙর নদী গ্রেনেড' (১৯৭৫ খ্রী.)

৪. 'মগ্ন চৈতন্যে শিস' (১৯৭৯ খ্রী.)

৫. 'যাপিত জীবন' (১৯৮১ খ্রী.)

৬. 'নীল ময়ূরের যৌবন' (১৯৮২ খ্রী.)

৭. 'পদশব্দ' (১৯৮২ খ্রী.)

৮. 'চাঁদবেনে' (১৯৮৪ খ্রী.)

৯. 'পোকা-মাকড়ের ঘরবসতি' (১৯৮৬ খ্রী.)

১০. 'নিরন্তর ঘন্টাধ্বনি' (১৯৮৭ খ্রী.)

১১. 'ক্ষরণ' (১৯৮৮ খ্রী.)

১২. 'কাটাতারের প্রজাপতি' (১৯৮৯ খ্রী.)

১৩. ‘খুন ও ভালোবাসা’ (১৯৯০ খ্রী.)

১৪. ‘কালকেতু ও ফুল্লরা’ (১৯৯২ খ্রী.)

১৫. ‘ভালোবাসা প্রীতিলতা’ (১৯৯২ খ্রী.)

১৬. ‘টানাপোড়েন’ (১৯৯৪ খ্রী.)

১৭. ‘গায়ত্রী সন্ধ্যা’ (১ম ১৯৯৪, ২য় ১৯৯৫ খ্রী.)

১৮. ‘দ্বীপান্বিতা’ (১৯৯৭ খ্রী.)

১৯. ‘যুদ্ধ’ (১৯৯৮ খ্রী.)

২০. ‘লারা’ (২০০০ খ্রী.)

২১. ‘মোহিনীর বিয়ে’ (২০০০ খ্রী.)

২২. আনবিক আঁধারে’ (২০০৩ খ্রী.)

২৩. ‘ঘুম কাতুরে ঈশ্বর’ (২০০৪ খ্রী.)

২৪. ‘মর্গের নীল পাখি’ (২০০৫ খ্রী.)

২৫. ‘অপেক্ষা’ (২০০৭ খ্রী.)

২৬. ‘দিনের রসিতে গিটঠু’ (২০০৭ খ্রী.)

২৭. ‘মাটি ও শস্যের বনন’ (২০০৭ খ্রী.)

২৮. ‘ছবির মগ্নতা’ (২০০৮ খ্রী.)

২৯. ‘ভূমি ও কুসুম’ (২০১০ খ্রী.)

৩০. ‘যমুনা নদীর মুশায়েরা’ (২০১১ খ্রী.)

৩১. ‘গাক্‌তির ছায়া নেই’ (২০১২ খ্রী.)

৩২. ‘সোনালী ডুমুর’ (২০১১ খ্রী.)

৩৩. ‘আগস্টের একরাত’ (২০১৩ খ্রী.)

এছাড়া ‘সাগর’ (১৯৯১), ‘কাকতাড়ুয়া’ (১৯৯৬), ‘আকাশপরী’ (২০০১), ‘চাঁদের বাড়ির পান্তা ইলিশ’ (২০০৮) প্রভৃতি শিশু সাহিত্য, ‘উৎস থেকে চিরন্তর’ (১৯৬৯), ‘মানুষটি’ (১৯৯৩), ‘মতিজানের মেয়েরা’ (১৯৯৬), ‘অবেলার দিনক্ষণ’ (২০০৭) প্রভৃতি গল্প সংকলন এবং ‘স্বদেশে পরবাসী’ (১৯৯৬), ‘একাত্তরের ঢাকা’ (১৯৮৯), ‘মুক্ত করো ভয়’ (২০০০), ‘নিজেরা করো জয়’ (২০০৮), ‘ঘর গেরস্থির রাজনীতি’ (২০০৮) প্রভৃতি প্রবন্ধাবলী পেয়ে থাকি আমরা।

সেলিনা হোসেনের ‘চাঁদবেনে’ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে। গ্রন্থটির দ্বিতীয়

মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে। দশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এক নিটোল কাহিনী রয়েছে এই উপন্যাসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৩৫০-এর দুর্ভীক্ষ, স্বাধীনতা, দেশভাগ, নতুন রাষ্ট্র গঠন প্রভৃতি ঘটনার পরেও বাংলাদেশে জমিদারতন্ত্রের অবসান ঘটেনি। একদল সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি, স্বার্থবাদী, হিংস্র লোভী মানুষ নিজেদের স্বার্থ ও সুখ চরিতার্থ করতে কৃষক ক্ষেতমজুর বা দরিদ্র চাষিদের সবকিছু কেড়ে নিয়ে তাদের সর্বহারার দলে পরিণত করে। একদিকে জোতদারী শোষণ ও অত্যাচার, অপরদিকে আকস্মিকভাবে নেমে আসা খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দরিদ্র মানুষকে আরো দরিদ্রতর করে তুলেছিল। জমি-জমা, ভিটে-মাটি, ঘটিবাটি, হালের বদল সবকিছু বন্ধক দিয়ে বা বিক্রি করে তারা হয়ে উঠেছে সর্বহারার দল। গ্রামের জোতদার, জমিদারের মতো সুবিধাভোগী শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে সাধারণ কৃষক বা খেতমজুরদের সর্বস্ব লুঠ করে নেওয়ার খেলায় মেতেছিল। চরম নিষ্ঠুর তথা ভয়ঙ্কর হিংস্র অত্যাচারী এই শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো সাহস দেখাতে কেউ পারত না। নিজের বেঁচে থাকার তাগিদে অন্যায়কে আপোষ করে নিত। নির্বিবাদে সব কিছু মেনে নেওয়া ছাড়া কারো উপায় ছিল না। এই চরম বৈষম্যতার ফলে মানুষের বিপন্নতা ও হতাশার মাঝখানে এক প্রতিবাদী চরিত্রের জীবনকে তুলে ধরার জন্য সেলিনা হোসেন রচনা করেন 'চাঁদবেনে' উপন্যাসটি।

উপন্যাসে চাঁদ চরিত্রকে আমরা পাই অধুনা বাংলাদেশের পদ্মার তীরবর্তী চম্পাইগঞ্জের বাসিন্দা রূপে। খরাতাড়িত রুক্ষ্ম আবহাওয়া ও শোষক সম্প্রদায়ের শোষণ ও অত্যাচারের প্রেক্ষাপট দিয়ে উপন্যাসটি শুরু হয়েছে। উপন্যাসের প্রথমেই আমরা দেখি চাঁদ জমিতে নিড়ানির কাজে কর্মরত। দুপুরবেলায় প্রচণ্ড রৌদ্র-ঘাস-লতা, গাছের পাতা আর মাটির নরম বুক সবই পুড়িয়ে দেয়। ফসল বাঁচানো সম্ভব নয় এই প্রচণ্ড খরায়। জমিতে কাজ করতে বুড়ো হানিফকেও দেখা যায়। বারো জনের সংসার তার। চম্পাইগঞ্জের আরো অনেক ব্যক্তিরই এরকম পারিবারিক বোঝায় ঘাড় বাঁকা। শুধু চাঁদের বউ ছাড়া আর কেউ নেই। চাঁদ বুড়ো হানিফের কাঁধে হাত রাখে, সান্ত্বনা দেয়। সবাই জানে দুর্ভিক্ষ এড়ানো যাবে না এবার, আসন্ন বিপদের দিকে তাকিয়ে তারা আতঙ্কিত। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, পদ্মার বুক থেকে ঘূর্ণির পাকে ধূ ধূ বালি উড়ে আসে। চাঁদের চোখ-মুখ গোটা শরীর বালিতে কিচ কিচ করে। এই ঘূর্ণি সব সময় তাকেই আঘাত করে। যেন তার উপর প্রবল আক্রোশ নিয়েই ছুটে আসে। চাঁদের বুক জ্বলে যায়। তার সামনে চড়চড় করে মাটি ফাটলে ভয়ে, আতঙ্কে এবং সর্বস্ব হারানোর বেদনায় থমকে যায় তার দৃষ্টি। বুক চাপড়ে হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে ও। আজু মৃধার মাটি হলেও মাটি ফাটা সহ্য করতে পারেনি সে। মনে হয়েছিল শরীরের রগে রগে

যেন চাবুক মারল, কলজেয় যেন লাঙল চষে গেল। মাটি ফাটা দেখে মনে হয়েছে মূলে ভাঙন ধরেছে, নাড়ি যেন উপড়ে আসছে। এই আঠাশ বছর বয়সের জীবনে সবকিছু যেন এলোমেলো হয়ে যায়। মাথা ঝিম ঝিম করে, শরীরের ভেতরে যেন দ্রুম দ্রুম করে ওঠে। মহাজন আজু মৃধার অত্যাচারের চাইতেও ভয়ঙ্কর এই মাটি ফাটার দৃশ্য। এই খরা যেন তার মারমুখো প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। আগাছা না থাকলেও শক্ত মাটিতে গাছের গোড়া কোপানো যায় না। চম্পাইগঞ্জের মানুষের মাটিই প্রাণ। দরিদ্র সর্বহারা মানুষেরা ফসল উৎপন্ন করেই জীবনযাপন করে। আর ফসল ফলানোতেই চাঁদের জীবনের একমাত্র আনন্দ। মাটির সঙ্গে তাঁর নাড়ির টান। এই টান প্রবল হলে তার সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে যায়। পাগল বৌ-এর পাগলামি সহ্য হয়, গ্রামের লোকেদের ঝগড়া-ঝাটির কথা মনে থাকে না, আজু মৃধার দুর্ব্যবহারও অনায়াসে ঝেড়ে ফেলতে পারেন— কিন্তু ফসলের ভাগাভাগি তার সহ্য হয় না। পরিশ্রমের ফসল আজু মৃধার উঠোনে ঢেলে রেখে কষ্ট বুকে চেপে বাড়ি ফিরে আসে। পদ্মার বুকেও বন্ধ্যা নেমে আসে। ছোটবেলায় উথলা পদ্মায় এখন ধূ ধূ বালু। স্ত্রী ছমিরণও পদ্মার মতো যৌবনে পরিপূর্ণ ছিল। চৌদ্দ বছরের বিবাহিত ছমিরণও ছিল শীতল নদীর মতো। ছ'মাস ন'মাসের একে একে সাতটি মৃত সন্তানের জন্ম দিয়ে শেষে পাগল হয়ে যায়। পাগল ছমিরণ পদ্মার মতোই শুকিয়ে কাঠ হয়েছে। খরা যেন চাঁদের জীবনেও নেমেছে। আজু মৃধার জমিতে ফসল নষ্ট হওয়ায় সে সমস্ত চাষীদের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করে। মাটি বিরুপ যতোই হোক, বৃষ্টি নাই বা হোল, কিন্তু আজু মৃধার জমিতে ফসল ফলানোই চাই, গোলা ভরা চাই তার। এইভাবে গৃহে এবং বাইরে ব্যর্থ হয়ে পড়ে চাঁদ। ফসলহীনা মাটি, ফসলহীন দিন, ফসলহীন চাঁদ। সে প্রতিবাদ করতে চায়। তবে মেঘহীন, জলহীন দিনগুলোর নির্মম পেষণের বিরদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে হয় তাকে। একা সে কতজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। পদ্মা তার শত্রু, মাটি তার শত্রু, আজু মৃধাও সাক্ষাৎ যম। একা দু'হাতে হেতালের লাঠি নিয়ে কতজনের সঙ্গে লড়বে চাঁদ। স্ত্রী ছমিরণের চিকিৎসার জন্য শহরে যেতে চায় সে। তাজা ফটফটে ছেলের মা হবে ছমিরণ। কোল জুড়ে আলো করবে চাঁদমুখ। তার চোখে স্বপ্ন ঘনিয়ে ওঠে। ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া বিশাল প্রান্তরে দিগন্তবিহারী শ্যামলতার থৈ থৈ চাঁদের রুক্ষ্মতা গলিয়ে দেয়। কিন্তু তার মত দরিদ্র লোকের শহরে যাওয়া, দুর্বিনীত পদ্মার নিরুপায় দূরে সরে যাওয়ার মতো। ইচ্ছে করলেই ফুলে ফেঁপে গর্জে উঠতে পারে না। ফারাক্কা বাঁধ, পদ্মা নদী, আজু মৃধা, চাঁদ সবাই যেন একই সুতোর বাঁধনে জড়িয়ে রয়েছে। পরিস্থিতির করুণ চিত্র উঠে এসেছে জীবন্তভাবে—

''ও শুনেছে ফারাক্কা বাঁধের কথা। সেই বাঁধের দরুণ ওর শৈশব কৈশোরের কীর্তিনাশা

পদ্মার পায়ে শিকল। বর্ষার ঢলও সে শেকল ভাঙতে পারে না। সেজন্যে এখন চাঁদের পায়েও বেড়ি। ... ফারাক্কার মতো আজু মৃধা। ওদের জওয়ানকীর পদ্মায় বাঁধ দিয়ে রেখেছে। সারাদিনের পরিশ্রমেও পানির গভীরতা বাড়ে না, অনবরত চড়া পড়ে, বালু বাড়ে।"[৩]

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে চাঁদের। বাবার সঙ্গে রাত্রিবেলা মনসার পালা শুনে ফেরৎ আসার সময় ফণিমনসার গাছ দেখে তার সাপ মনে হয়েছে। ছোটবেলার পালাগান দেখে মনসাই প্রধান হয়ে উঠত তার কছে। এখন যৌবনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে চাঁদ বণিকের বলিষ্ঠতা, সততা তাকে মোহিত করে তোলে। তাই বণিকের সপ্তডিঙা ডুবে গেলে তার লোম খাড়া হয়ে যায়। মনসাপালায় চাঁদকে দেখলে তার বাবার কথা মনে পড়ে। অভাব পিতাকে কোনদিন টলাতে পারেনি। ডাকু বুকে কোনো ভয়-ডর ছিল না। অবলীলাক্রমে নৌকা ভাসিয়ে দিত নদীতে। হেরে যাওয়া কাকে বলে জানতো না। চাঁদের মনে হয় বাবার সামনে পদ্মা নামের একটা দিগন্তস্পর্শী কালীদহ ছিল বলেই অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করেও তার কোনো কমতি ছিল না। তাই সবসময় এগিয়ে যাওয়ার পথে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু সামনে শুধু মজে যাওয়া পদ্মা ও প্রতিপক্ষ খরা। আদর্শ মেনে নেওয়ার মতো কোনো কিছু সামনে দেখতে পায় না সে। সাহস বাড়িয়ে দেওয়ার মতো কোনো কিছু অবলম্বন খুঁজে পায় না। সে জানে শূন্যতায় স্বপ্ন থাকতে নেই, তার জন্যে চাই পলিমাটির উর্বরা সমতল। আর জীবনের সব শূন্যতার মধ্যে একমাত্র সম্বল জমি। সেই জমিই এখন ফেটে চৌচির। চাঁদের মতে বাবা মানুষের মতো মানুষ ছিলেন— যেমন গোয়ার, তেমনি জেদী। গ্রামের লোকে মানত, ভয় পেত, লোকে পিছন দিক থেকে শত্রুতা করত। নৌকা বাইতে যাওয়ার সময় তার নৌকা সবার আগে ছুটত। পদ্মার সর্বনাশা স্রোতে নদীর পাড় ভেঙে গেলে হা হা করে হেসে ওঠে। পদ্মা সমস্ত জমি গ্রাস করে নিলেও সে মাথা চাপড়ায় নি। কত খেতে পারবি খা বলে নদীকে গালিগালাজ করে। বাবার মতো শরীরের শক্তিকেই নিজের অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে চাঁদ। মানুষ সমস্ত কিছু নিলেও, নিতে পারে না শুধু এই গায়ের বল। বাবার মতোও তার একমাত্র সম্বল শক্তি ও পরিশ্রম। তাছাড়া আর কোন মূল্য নেই তার। এই জন্যই আজু মৃধা তাকে পাত্তা দেয়, আজু মৃধার তাকে প্রয়োজন। এই নিয়েই তার বেঁচে থাকা। এই নিয়েই তার যুদ্ধ। খরা তার পেছনে ছুটে আসে, নদী মুখ ফিরিয়ে নেয়। মাটি ফেটে গিয়ে চৌচির হয়ে যায়, তবুও সে লড়ে যায় বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে। চাঁদ নিঃস্বের বেদনা অনুভব করে ছমিরণকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। যৌবনে যে ছমিরণ কালীদহ ছিল, যেখানে নির্বিবাদে সপ্তডিঙা ভাসিয়ে দিত চাঁদ। কেমন করে মনসার অভিশাপ এসে সমস্ত কিছু ডুবিয়ে দেয়। চাঁদ এই

ছমিরণের শুষ্ক শরীরে শীতলতা প্রবাহিত করে, শরীরের বাঁধ দূরে সরিয়ে স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণীতে পরিণত করে। এইভাবে আশার মধ্য দিয়ে প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটান লেখিকা। ছমিরণের ক্রুর হাসিকে থামিয়ে চাঁদ তাকে শান্ত ও শীতল করে তোলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে চাঁদের একক লড়াই-এর সংকল্প নিয়ে। কারণ চম্পাইগঞ্জের মানুষের শিরা-উপশিরায় বিষ। সেই বিষে নির্জীব হয়ে গেছে শরীরের টগবগে রক্ত। শুধু চাঁদ একা আজু মৃধার সঙ্গে লড়াই করে যায়। অন্যায় হলে ছেড়ে কথা বলে না। সাঁড়াশির মতো চেপে ধরে আজু মৃধার চর্বিমাখা গলা। মুখে কিছু না বলে আজু মৃধা গোল গোল চোখ করে তাকিয়ে থাকে। এতে চাঁদ ভীষণ আনন্দ পায়। বাতাসে উড়িয়ে দেয় লক্ষ লক্ষ প্রতিবাদের বীজ। চম্পাইগঞ্জের মাটিতে এই বীজ থেকে হবে কালচে সবুজ চারা। কারণ একা আজু মৃধা বেশিদিন অত্যাচার চালাতে পারবে না। তাই বিপদ মুক্ত চম্পাইগঞ্জ এবং গ্রামে সৎ ব্যক্তি আগমনের স্বপ্ন দেখে সে। চাঁদ নিজের ব্যক্তিত্বে অটল থাকে। পিতা প্রসঙ্গে আবার চাঁদ বলে— বাবা মহাজনের নৌকায় পণ্য নিয়ে পদ্মার বুকে অনায়াসেই পাড়ি দিত। মায়ের দুঃখকে পাত্তা না দিয়ে পদ্মায় ঘোরার নেশায় মহাজনের নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। ফিরে আসত শূন্য হাতে। আসলে বাবা অভাবকে কোন আমল দিত না। পুত্রের মধ্য দিয়ে সে ভবিষ্যৎকে দেখতে চায়, জয় করতে চায়। আজু মৃধা বিলের জমি দখল করলেও, পরিশ্রমের পয়সা না দিলেও মহাজনের বিরুদ্ধে বাবার কোনো নালিশ ছিল না। বিরাট আকৃতির শরীর থাকা সত্ত্বেও রুখে দাঁড়াবার কথা ভাবত না। মহাজনের সঙ্গে ছিল তার প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। সামনে অঢেল সবুজের ফলে পিতার মনে দরদ ছিল। কিন্তু এখন আর সবুজ নেই, ফসল নেই, পদ্মায় জল নেই। তাই মহাজনের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক। মাথার মধ্যে কাজ করে শুধু ধুলোয় লুটিয়ে দেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সে আজু মৃধাকে ঘৃণা করে, মুখে থু থু ছিটোতে চায়, পায়ে দলিয়ে রাখতে ইচ্ছা করে। চাঁদ আরো বলেন—

> ''সুযোগ পেলে ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে সেটা পদ্মার বালুতে পুঁতে রাখবো। আমার নিজের জমি নেই। তবু আমি মাটি ভালোবাসি। হোক না তা অন্যের।''[৪]

মানুষের মন থেকে এখন উৎসবের জোয়ার-ভাটিতে নেমে গেছে। এই ভাটি চিরকালের। সেখানে আসা যাওয়ার খেলা নেই। শৈশবে মনসার পালা শুনে ফণিমনসার যে ঝোপগুলি দেখতে দেখতে বাড়ি ফিরতেন সেগুলি আর নেই। এখনকার গাছ, লতাগুল্ম কোন কিছুতেই চোখ জুড়োয় না, মন ভরে না, পেটও ভরে না। পথঘাট শুধু শুকনো ধুলোয় পরিপূর্ণ। তবুও চাঁদ চোখ বুজলে মনসার

পালা দেখে। চাঁদ বণিকের গল্প শুনতে শুনতে রাত ফুরোয়। আকাশের তারা মিলিয়ে গিয়ে দিনের আলো ঘনিয়ে আসে। মগজে তার ঘূর্ণি ওঠে। চাঁদবেনে হয়ে সে পথে নামে, চাঁদবেনে হয়ে ঘরে ঘরে ফেরে, দিনযাপন করে।

পদ্মার যৌবনও ছমিরণের মতো ফুরিয়ে গেছে। রুক্ষ নিদারুণ দিনগুলো ছমিরণের মতো রাগী, বদমেজাজী, অসহিষ্ণু। মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যায়। শহরে গিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করার কথা ভাবে। অথচ আজু মৃধার মতো ব্যক্তির গোলা পূর্ণ হয় ধানে। চাঁদ তাই সাধারণ মানুষকে বেঁচে থাকার আশ্বাস দেয়, যেভাবেই হোক ভাত-খাবার কথা বলে। জমির, কাশেম, হাসু, ফালু, হাফিজ মিঞাদের নিয়ে আজু মৃধার গোলার ধান লুঠ করবে বলে স্থির করে।

বিরূপ প্রকৃতির দরুণ বাতাসে ভ্যাপসা গরম, চামড়া পুড়িয়ে কালো করে তোলে। একসময় চম্পাইগঞ্জের পাশ দিয়ে সপ্তডিঙা মধুকর ভেসে যেতো। এখানে বেহুলারা কলসি কাঁখে জল আনতে গিয়ে নদীতে নেমে জল ছিটোতে ছিটোতে চোখ লাল করে ফেলত। সেই স্থানে এখন শুধু অভাব। পদ্মার জল শুকানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জমি, ফসল সবই শুকিয়ে গেছে। ঐ আজু মৃধারা যতকাল আছে, আকাল দরিদ্র কৃষক মজুরদের থেকে ততদিন দূর হবে না। এই নিঃস্ব, সর্বহারা মানুষদের কেউ নেই। ঘরের বউও বেহুলা নাচনি হতে পারে না। যতক্ষণ নিজের শক্তি আছে, নিজের পায়ের তলার মাটি আছে এবং বুকে সাহস আছে ততদিন তারা বাঁচবে। না হলে নেতা ধোপানীর কাপড়ের ময়লার মতো ধুয়ে মুছে যাবে। গ্রাম আর সাধারণ মানুষের থাকে না। চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি এখন অন্যের দখলে। নিজের কোন কিছুই থাকে না। তাই পেটের দায়ে হাফিজ মিঞার মতো বৃদ্ধ মানুষ ভাত খাওয়ার থালা দুটি বিক্রি করে ফেলে। চাঁদের তাই মনে হয় আজু মৃধার গোলাতে যতোই লোহার দেওয়াল থাক না কেন, একটা না একটা ছিদ্র তো রয়েছে। যেখানে তারা অনায়াসে ঢুকতে পারবে। ধান চুরি করে এনে এভাবেই তাদের বেঁচে থাকতে হবে। কারণ চম্পাইগঞ্জের শরীরের ফুটো দিয়ে অভাবের সাপটা যে ঢুকেছিল সেটা এখন কিছুতেই বেরোচ্ছে না। সেটা এখন পাগলের মতো কামড়াচ্ছে তাদের। হাফিজ মিঞা, জমির, কাশেম, শহরে যায় লাইনে দাঁড়িয়ে আটা আনতে। উপন্যাসে অভাবের চিত্র করুণভাবে ফুটে ওঠে হাফিজ মিঞার বাড়ির বর্ণনায়। হাফিজ মিঞার মেয়ে সকিনা তার ভাই-বোনদের মাসকলাইয়ের রুটি, ছোলাভাজা খাইয়ে ঘুম পাড়ায়। একবেলাও ভরপেট না খেতে পেয়ে হাফিজ মিঞা ভিটা বিক্রি করে শহরে চলে যেতে চায়। এমনকি আজু মৃধার গোলায় ধান লুঠ করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও ভাত খাবার কথা ভেবে খুশি হয় তারা। কিন্তু চাঁদ আপোষ করতে নারাজ। ছমিরণ ও সে মিলে

লখীন্দরের মতো সন্তান নিয়ে আসবে ভবিষ্যতের জন্য। আজু মৃধার গোলা লুঠ করে এবং ছমিরণের পেটে একটা তাজা ফটফটে ছেলের বীজ রোপন করে নিজেকে এক সার্থক পুরুষে পরিণত করতে চায়।

উপন্যাসের চতুর্থ অধ্যায়ে দেখি অভাবের তাড়নায় কাকতাড়ুয়ায় ভরে গেছে চম্পাইগঞ্জের পথ-ঘাট, মাঠ-প্রান্তর, খাল-বিল, পদ্মার বালুচর। মানুষ মারমুখী হয়েছে, নিষ্ঠুরতার জাল ছড়িয়ে যাচ্ছে মানুষের মধ্যে। এখন আর সেই চম্পাইগঞ্জ নেই, যেখানে চাঁদ সপ্তডিঙা মধুকর ভাসিয়ে ধনপতি চাঁদ সদাগর হয়ে বাণিজ্যে যাবে। হাতির দাঁতের কাজ, সুগন্ধী মশলা আর মসলিনে বোঝাই জাহাজ নিয়ে বন্দর থেকে বন্দরে ঘুরবে সে। তার পণ্যের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকবে সবাই। এইভাবে চাঁদ আশার মধ্য দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। উপন্যাসে চাঁদের মুখে তাই অনায়াসেই শোনা যায়—

> ''চেঙমুড়ি কানী বিটি আজু মৃধা আমাকে ছোবল দেয়। সে বিষে আমি মরি না। আমি তা হজম করে নীলকণ্ঠ হই। আমি জানি আমার বেহুলা নেই যে মরা লাশ বুকে নিয়ে জলে ভেসে বেড়াবে।''[৫]

মনসামঙ্গলের বেহুলা দেবসভায় গিয়ে অনুনয়-বিনয় করে শ্বশুর চাঁদের দ্বারা মনসাপূজা দেওয়ার শর্তে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনে। এই ভিক্ষাবৃত্তিতে চাঁদের বিশ্বাস নেই। সে এমন এক বেহুলা চায় যে বিষক্ষয়ের অয়োজন করে শক্তিমান হয়ে লোহার চাল হজম করতে পারবে। আসলে পিতাই চাঁদকে অন্য মানুষ করেছে। ভর দুপুরে আম বাগানেয় ছায়ায় হাত পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকা তার পোষায় না। বলদের মতো খাটনি খেটে খেটে জাবর কাটায় তার দারুণ ঘৃণা।

কখনো কখনো তার হাতে পায়ে অসুরের শক্তি বেড়ে ওঠে। দৌড়ে গিয়ে সে মাঠে নামে। দিগন্তরেখার সীমানায় তাকিয়ে তার বোধ ফসলের প্রাচুর্যে ভরে ওঠে। নতুন দিনের স্বপ্ন দেখে সে। তার মতে, চাঁদ বণিকের ময়ূরপঙ্ক্ষীর স্বপ্ন দেখে বুক বাঁধে সে। চাঁদের জীবন থেকে সবকিছু হারিয়ে গেলে নতুন সম্ভাবনায় অন্ধকার দেখে। মায়ের সোহাগ, বাপের ভালোবাসা। আজু মৃধার ক্ষেত মজুর ছমিরণের স্বামী চাঁদবেনে কোন জমির মালিক হতে পারে নি। সন্তানের বাবা হতে পারেনি। তাই ভিটেমাটি বন্ধক রেখে স্ত্রীর চিকিৎসা করাবে বলে স্থির হয়। কারণ ভালো ডাক্তার পেলে, ওষুধ পেলে তাদের জীবনটা অন্যরকম হবে। চাঁদ ছেলে-মেয়ের বাবা হবে। আজু মৃধার ঘাড়ের উপর থেকে মাথাটা ফেলে দিবে। সব জমি ক্ষেত মজুররা ভাগ-বাটোয়ারা করতে পারে। জমির মালিক হবে। চাঁদের বাবার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া বিল জমিতে আজু মৃধা চাষ করতে চায়। এই জমিতে চাঁদকে পাঠাতে চায় সে। তাই চোখ রাঙালেও মহাজন তাকে তোয়াজ করে।

তার শরীরে শক্তি আছে। বুকে সাহস আছে। প্রয়োজনে হেতালের লাঠি নিয়ে মারতে উদ্যত হতে পারে। আজু মৃধার তোয়াজে তার কিছু যায় আসে না। 'তাঁর জীবনের পুরোটাই খরা। ফসলহীন জীবনটার শ্যামলার জন্য চাঁদ তৃষ্ণার্ত। চাঁদ তাই সুদিন চায়। সব মানুষকে নিয়ে চম্পাইগঞ্জের একটাই পরিবার গড়তে চায় সে।

মানুষ নিজের অস্তিত্বের সংকটে পড়ে অভাবের তাড়নায়। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায় সাত্তারের মা অনায়াসেই চেয়ে বসে ছেলেকে ধার দেওয়া টাকা। ছেলে, বৌ, নাতিপুতি না খেয়ে থাকলেও তার কোন আক্ষেপ নেই। সুদের ব্যবসার মহাজন হবার চিন্তায় সে মগ্ন। চিবোতে না পারলেও চাঁদের প্রতিবেশী চাচীকে মাসকালাইয়ের রুটি খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়। কয়েক কেজি আটা পাবার আশায় শহরে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইন দিয়ে অজ্ঞান হয়ে মারা যেতে হয় গ্রামের ক্ষেতমজুর জমিরকে। আর এভাবেই জমিরের মতো চম্পাইগঞ্জের মানুষগুলো মারা যাবে। আবার নজিবর ভাই পেটের দায়ে হালের বলদ বিক্রি করে দুই ছেলে ফজর ও নজরকে হাল টানার কাজে লাগায়। অন্যদিকে চাঁদ ও সকিনার রোম্যান্টিকতার দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে সুন্দরভাবে। ভিটে বন্ধক রেখে স্ত্রী ছমিরণকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যায় চাঁদ। কিন্তু চাঁদ সমস্ত টাকা খরচ করে উজাড় হয়ে ঘরে ফিরে। যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে শহরে গিয়েছিল সমস্তটাই সে পাথুরে দেওয়ালের শহরে রেখে এসেছে। সারাজীবনে সে যতটুকু পেয়েছে তার থেকে হারিয়েছে বেশি। নিজের জীবন সে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতি এসে বাধা দেয়। প্রকৃতির কাছে হার মানতে নারাজ চাঁদ। শহরের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে সে ঘরে ফিরেছে তাকে সে অতিক্রম করতে চায়। ছমিরণ যে সন্তান পাবে না, আজু মৃধা ভিটে দেবে না— এই দুটোকেই অতিক্রম করবে চাঁদ। মানুষ ও প্রকৃতি দুটোকেই সে জয় করতে চায়। চম্পাইগঞ্জের মানুষ তাকে পরাজিত ব্যক্তি ভাবলেও চাঁদের একটা লখীন্দর চাই। যে লখীন্দরকে সাপে কামড়ায় না। যে লখীন্দরের জন্ম হলে চম্পাইগঞ্জের খরা, অজন্মা, অনাবৃষ্টি কেটে যাবে। এই গ্রাম ও গ্রামের মানুষ তার আপনজন। এ ভূমি হচ্ছে তার প্রিয় ভূমি, এখানে তার শেকড় প্রোথিত। তাই সে তোরাব, নুরু, কাশেমদের মতো কাজের খোঁজে শহরে চলে যায়নি। আপাতদৃষ্টিতে যতই পরাজিত হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। এক ছমিরণ না পারলে সে অন্য ছমিরণ খুঁজে নেবে। সে মাটি চিনেছে, চষা জমি চিনেছে, বীজ চারা, আগাছা চিনেছে। কিন্তু ফসল চিনতে পারেনি। জন্মের সময় শরীরের ফুটো দিয়ে যে সাপ তার শরীরে প্রবেশ করেছে, সেটা এখনো ফোঁসফোসায়। তার হাত দিয়ে আজু মৃধার গোলায় ফসল চলে যায়, তার বাবা-দাদা কেউই আড়াল করতে পারেনি। কিন্তু সে চাইনি আর কেউ দিক। নিজেদের ভাগ্য

তারা নিজেরাই গড়ে তুলতে চায়। নিজেদের উৎপাদিত ফসলের গোলা নিজেরাই বানাবে। চষা জমি বানাবে। নবান্নের উৎসব মাসব্যাপী জাগিয়ে রাখবে। সে এমন চাঁদবেনে চায় যার 'হিন্তালের' লাঠির ভয়ে মনসা লুকিয়ে থাকবে, মাথা তোলার সাহস পাবে না। সেই সঙ্গে সে নতুন ভিটে গড়বে। সকিনা এখন তার সেই স্বপ্নের ইঙ্গিত। এক ছমিরণের ব্যর্থতায় সে ফুরিয়ে যাবে না। তাই আজু মৃধার দখলকৃত ভিটের জন্য লড়াই করবে। কোনরকম গ্লানি হতাশা সে মনে রাখবে না। সকিনাকে উর্বরা নারী রূপে গ্রহণ করবে। তার কথা ভাবতে ভাবতে প্রশান্তির ঘুম দেয়। এই ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখতে চায় কালীদহে সপ্তডিঙা প্রস্তুতের, যার সাহায্যে বাণিজ্যে যেতে পারবে।

সপ্তম অধ্যায়ে কাদা-জলে আটকা পড়ে স্ত্রী ছমিরণের মৃত্যু হলে চাঁদ সকিনার মধ্যে নতুন জীবন খোঁজার চেষ্টা করে। চাঁদ ও সাকিনার রোম্যান্টিকতার চিত্র পাই আমরা এভাবে—

> ''চাঁদ সকিনাকে কাছে টানে। ওদের ভাষা বদলে যায়। স্পর্শ এবং ঘ্রাণের মধ্যে দুজনে বিহ্বল হয়ে থাকে। অন্ধকার গাঢ় হলে আম বাগানের পথে সকিনাকে অনেকটা পথ এগিয়ে দিয়ে আসে চাঁদ। আম বাগানের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ওকে বিদায়ের চুমু দেয়। আগামীকাল চলে যাবে বিলের জমিতে।''[৬]

আজু মৃধার বিলের জমিতে কাজ করতে যায় চাঁদ। এখান থেকে ফিরে এলেই সকিনার সঙ্গে তার বিয়ে। নতুন জীবনের স্বপ্ন চাঁদকে আচ্ছন্ন করে। সকিনার ভালোবাসা পেয়ে সে নিজেকে সম্পন্ন মানুষ বলে মনে করে। সকিনা তাকে ফসলের স্পর্শ দিয়েছে, তাই চাঁদের সাহস দ্বিগুণ বেড়েছে। সকিনার গাঙুড়ের জলের স্রোতে সে অমিত বিক্রমে সপ্তডিঙা মধুকর পাল উড়িয়েছে। তার বুকে মুখ গুঁজে সে হাজার বছরের চম্পাইগঞ্জ খুঁজে পায়। উপন্যাসের শেষের দিকে চাঁদের বিদ্রোহের প্রকাশ চরমভাবে দেখা দিয়েছে। নিজের অধিকারবোধ চূড়ান্তপর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আজু মৃধা তার বন্ধক রাখা ভিটেমাটি কায়দা করে হস্তগত করে নেয়। চাঁদ এই প্রতিশোধ নেয়, আজু মৃধার বিলের জমিতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে; আজু মৃধা এই পোড়া জমি দেখে চাঁদকে গালিগালাজ করলে প্রতিবাদের সুরে বলে—

> ''হামি চম্পাইগঞ্জের মাটি চিনি, ফসল ফলাই। হামার আবাদ বাদে আপনাগোরে গোলা ভরে না। চম্পাইগঞ্জে হামি থ্যাকবো নাতো থ্যাকবেন আপনি?''[৭]

আজু মৃধা চাঁদের গালে চড় মারলে চাঁদ মুহূর্ত দেরি না করে হাতের ধারালো দা দিয়ে তার ঘাড়ের উপর কোপ দেয়। আজু মৃধার রক্ত দেখে চাঁদের বড় আনন্দ হয়। লাথি দিয়ে শরীরটাকে এ পাশে ও

পাশে গড়ায় ফুটবল খেলার মতো। বালির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যায় পদ্মার ধারে। দেহ ও মুণ্ডু পদ্মার জলে ভাসিয়ে দেয়। অত্যাচারী আজু মৃধাকে নির্মূল করে চারিদিকের শত্রুকে রুখে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত হয় চাঁদ। অন্যদিকে সকিনার পেটে জন্ম হয়, ভবিষ্যতের প্রজন্ম। সে নিজেকে চম্পাইগঞ্জের স্বাধীন মানুষ এবং ধনপতি বণিক মনে করে। তার জাহাজভরা সাহস ও শক্তির পণ্য আছে। আরো আছে পরিশ্রমের 'মাদুদি'। সে যে ঘাটেই জাহাজ নিয়ে যায় না কেন, সবাই হুমড়ি খেয়ে তার পণ্য কিনবে। তবে সে কোন মূল্যে পণ্য নিঃশেষ করবে না। বাতাসে উড়িয়ে দিবে তার বীজ। সেই বীজে চারা গজাবে এবং তা দ্রুত বেড়ে মহীরূহে পরিণত হবে। আর আজু মৃধার মতো স্বার্থান্বেষী, লোভী কাপুরুষ ব্যক্তিরা তাকে ভয় পায়। তার মধ্যে আরো সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে বিদ্রোহের ধ্বনি এই বক্তব্যে—

> ''আমি শাণিত ছুরি হয়ে ওদের মেদবহুল বুকে আমূল সেঁধিয়ে যাই। চাঁদ সদাগর মনসাকে দিয়েছিলো কড়ে আঙুল দিয়ে পূজো। কড়েতে আমার বিশ্বাস নেই। আমি চাই মুণ্ডু।''[৮]

বিচ্ছিন্ন ধড় থেকে গলগলিয়ে বেরিয়ে আসা রক্তে কীর্তিনাশার পলি ফেলে যে উর্বরা জমি তৈরী হবে সেখানে ফসল ফলানোর সংকল্প করে। নিষ্ফলা মাটিতে এভাবে গড়ে তুলবে ফসলের রগরগে বৈভব। তাই সকিনার পেটের সন্তান তার অহংকার। সে একজন গর্বিত পিতা হবে। তাদের লখীন্দরকে লোহার দেয়াল দিয়ে আড়াল করতে হবে না। এই লখীন্দরের জন্ম হবে খোলা আকাশের নীচে গাছের উন্মুক্ত তলায়। তারা কোনো পাপ করেনি। তাই কোন লজ্জা নেই, ভয় নেই। এই লখীন্দর আজু মৃধাদের বেড়ে ওঠাকে রুখবে। চম্পাইগঞ্জের মাটিতে আর কোন আজু মৃধা থাকবে না।

জনপ্রিয় লেখিকা সেলিনা হোসেন 'চাঁদবেনে' উপন্যাসে লেখেন এক নতুন জীবন সংগ্রামের কাহিনী। তাঁর কলমে রচিত হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক ডিসকোর্স। পুরাণের কাহিনী বা মিথের পুনর্নির্মাণে নয়, তিনি রচনা করেন বিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের এক দরিদ্র নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের সংগ্রামের কাহিনী। চাঁদবেনে চরিত্রকে কেন্দ্র করে ঘটিয়েছেন আমাদের চেতনার মধ্যে দিয়ে লোকপুরাণের ভাঙাগড়া। মনসামঙ্গল কাব্যের অন্তর্বিষয়বস্তুকে 'বিকল্প প্রেরণা' হিসাবে গ্রহণ করে তাকে যন্ত্রণাবিদ্ধ সময়ের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সর্বগ্রাসী অবক্ষয় ও বিপন্নতার বিরুদ্ধে যাত্রা করার জীবনী শক্তি হিসেবে মনসামঙ্গল কাব্যের মিথকে ব্যবহার করে তিনি নতুন কাহিনী রচনা করেন। আধুনিক জীবনসংগ্রাম ও প্রতিবাদী চেতনার কেন্দ্রে উপনীত করেছেন চাঁদ চরিত্রকে।

তাঁর চাঁদবেনেকে দেখি বিশ শতকের সংকটময় বেড়াজালের মধ্যে মনসামঙ্গলের চাঁদবেনের বিশ্বাস নিয়ে জীবনসমুদ্রে শোষণ ও বঞ্চনার আবরণকে ভেঙে প্রারম্ভিক বিপর্যয়ের আঘাত ও মানুষের তৈরী নিয়মাবলীকে অতিক্রম করতে চায় সে।

আমরা দেখি চাঁদ চরিত্রের কথনের মধ্য দিয়ে পুরো উপন্যাসটি বর্ণনা করেছেন লেখিকা। নিজের জীবনের অতীতের বর্ণনা করে চাঁদ পিতার জীবনের দারিদ্রের কথা, বিপর্যয়ের কথা তুলে ধরেছেন, সেই সঙ্গে নিজের জীবনের বিপর্যয়, হতাশা গ্লানির বর্ণনা করেছেন। তবে সে নিজের জীবনে হেরে যাওয়ায় থেমে থাকেনি। খুঁজে নিয়েছে বিজয়ের পথ। জীবনের সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয়েছে সে। মনসামঙ্গলের কাহিনীকে পুরোপুরি গ্রহণ করা হয়নি এই উপন্যাসে। তবে চাঁদ চরিত্রকে অবলম্বন করা হয়েছে প্রতিবাদী চরিত্র হিসাবে। মনসার প্রসঙ্গ এসেছে বিশ শতকের অন্যায়-অত্যাচারী হিংসাত্মক শ্রেণীর প্রতিনিধি রূপে। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের আলো হিসেবে মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের অনুষঙ্গ ব্যবহার করে নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করেছেন লেখিকা। যেমন— ১. উপন্যাসের প্রথমেই আমরা জানতে পারি উপন্যাসের প্রাণ অর্থাৎ মুখ্য চরিত্র চাঁদের নামের কথা। মা তাকে আদর করে ডাকত চাঁদ। বাবা 'আকিকা'র সময় ভালো নাম রাখলে সেটা বিয়ের কাবিল এবং জমির দলিল ছাড়া একবার শুধু আজু মৃধা পুলিশের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন। তারপর সেই নাম অস্তমিত হয়েছে। মানুষে তাকে চাঁদ নামেই চেনে। নামের সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ চরিত্রের বলিষ্ঠতা, সততা, একনিষ্ঠতা মনসামঙ্গলের চাঁদের মতো পাই। সে নিজেকে একা ভাবে, পাগল স্ত্রী ছাড়া সাতকুলে তার কেউ নেই। ধূর্ত মহাজনের জমিতে চাষ করে। জীবনের চলার পথে সবকিছু হারিয়ে ফেলে চাঁদ। কিন্তু মনোবল হারায়নি সে। নতুন করে আবার বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে। মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের মতো হেতালের লাঠি নিয়ে সমস্ত বাধাবিপত্তিকে দূর করতে চায়। মনসারূপী অন্যায়কে দূরে সরাতে চায়।

২. সাপের প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। রাত্রিবেলা বাবার সঙ্গে মনসার পালা দেখে ফেরার সময় ফণিমনসার গাছ দেখে তার সাপ মনে হয়েছে। সাপের ফণার মতো ফণিমনসার গাছ দেখতে। তাই দেখে ভয় পায় চাঁদ।

৩. বাবাকে চাঁদ বণিকের সঙ্গে তুলনা করেছে চাঁদ। চাঁদ সওদাগর যেমন সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সমুদ্রে পাড়ি দেয়। উপন্যাসে চাঁদের পিতাও অবলীলাক্রমে নৌকা বেয়ে যেত পদ্মানদীতে। বাবাকে মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর মনে হয়েছে। তাই বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে—

''প্রবল ঢেউয়ের মাথায় তুমি কি অবলীলায় নৌকা বাও ? পণ্য-ফেরি

করো ঘাট থেকে ঘাটে। মহাজনের পণ্য। তুমি কি সেই মনসার পালার সদাগর।”[৯]

তেমনি চাঁদের বাবা নিজে প্রকৃতির বিরুদ্ধে, বিপক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু স্বপ্ন দেখা ছাড়েনি। জমি, ফসল সমস্ত হারিয়েও সে ভেঙে পড়েনি। মুখে হাসির ফোয়ারা নিয়ে সবকিছু ভুলে থাকত। পুত্র চাঁদকে সে লখীন্দর বলে উল্লেখ করে। এই লখিন্দর সপ্তডিঙা মধুকর ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সমুদ্রে। চাঁদের বাবার কথায়—

> ‘‘তুই হামার লখীন্দর। পারবু না সপ্তডিঙা মধুকর ব্যানাবার? আমি বলতে পারতাম না যে কেমন করে বানাতে হয় বাবা? আমি ঘাড় নেড়ে বুক টান করে বলতাম, প্যারমো বাবা, প্যারমো।”[১০]

৪. উপন্যাসে ছমিরণকে কালীদহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যৌবনে ছমিরণ ছিল কালীদহের মতো। সেখানে চাঁদ তার সপ্তডিঙা মধুকর ভাসিয়ে দিত নির্বিবাদে। সেখানে মনসার অভিশাপ এসে সব ডুবে গেল, ডুবে গিয়ে তলিয়ে গেল। আবার ছমিরণের হাসিকে ছোটবেলায় দেখা মনসা পালার মনসার ক্রুর হাসি মনে হয়।

৫. অনাহার ও দুর্ভিক্ষের সময়ে মানুষ গল্প শুনে শান্তি পায়। কোন কিছু অবলম্বন না পেয়ে, আশার আলো দেখতে না পেয়ে শুধু গল্পের মধ্যে নিজেদের মুখ খুঁজে নেয়। তা শুনে আরাম পায়। তাই মানুষ রাত জেগে জেগে মনসার পালা দেখে। সপ্তডিঙা মধুকরের সমুদ্র যাত্রা, লখীন্দরের মৃত্যু, বেহুলার নাচ করে শ্বশুরের সপ্তডিঙা দেবতার কাছ থেকে চৌদ্দডিঙা করে আনা, ছয় ভাসুরকে জীবিত করে নিয়ে আসা প্রভৃতি গল্প শুনতে শুনতে তাদের প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সাধারণ দরিদ্র মানুষের শান্তির গল্প হয়ে ওঠে এই মনসার কাহিনী।

৬. উপন্যাসে চাঁদ নিঃস্ব, হেরে যাওয়া মানুষ হিসাবে সবকিছু মেনে নেয়নি। প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে চাঁদবেনে হয়ে ঘরে ফিরে, নতুন স্বপ্ন দেখে, তাই নিজের সন্তান কামনা করে। যে লখীন্দর হয়ে আবার নৌকার হাল ধরবে, জীবন সমুদ্রে জয়লাভ করবে। তাই ছমিরণের পেটে সন্তান আসার খবরে সে উল্লসিত হয়, আনন্দে মাতিয়ে তোলে গোটা ভুবন, প্রশান্তির ঘুম দেয়।

মনসামঙ্গলের উপরিউক্ত অনুষঙ্গগুলি থাকলেও লেখিকা এই মনসামঙ্গলের কাহিনীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে তৈরী করেন আর এক কাহিনী। বিশ শতকের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমকালীন মানুষের জীবনচিত্র তুলে ধরেছেন। এখানে চাঁদের এই সংগ্রাম কোন গোষ্ঠী চেতনায় আবদ্ধ না থেকে চম্পাইগঞ্জের মাটি ও মানুষজনকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য সে একাই যুদ্ধের ময়দানে

নেমেছে। তাদের শ্রেণীশত্রু আজু মৃধাকে খুন করেছে সে একাই। এখানে লেখিকা সেলিনা হোসেন চাঁদ চরিত্রের গৌরবকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। সে তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব দিয়ে অন্যায়-অত্যাচার, শোষণ যন্ত্রণার বিরুদ্ধে একাই সংগ্রাম করে স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে। এখানে তার জয় সমাজ বিবর্তনের নতুন দিগন্ত রচনা করে। চাঁদের এই সাফল্যের কেন্দ্রে রয়েছে মনসাপুরাণের আবেগ। লেখিকা এখানে প্রচলিত বিশ্বাস ও পুরাণকল্পকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলে নিজের মতো করে মনসাপুরাণ রচনা করেন। প্রচলিত কাহিনীকে ভেঙে নির্মাণ করেন নতুন জীবনের কাহিনী। উপন্যাসের চাঁদ হল আজকের চাঁদ। পুরাণের চাঁদ বণিকের মতো মনসার কাছে আত্মসমর্পণ করা অসহায় পুরুষ নয়। তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এক সাফল্যময় পুরুষ। এই চাঁদ তাই অনায়াসেই খুন করে ফেলে মনসার প্রতিভূ মহাজন আজু মৃধাকে। পুরাণের চাঁদ সদাগর বাধ্য হয়ে দিয়েছিলেন বাম হাতের কড়ে আঙুলে মনসাপূজা। কিন্তু আজকের এই চাঁদের কড়েতে বিশ্বাস নেই। তার চাই মুণ্ডু। রক্তমাখা মুণ্ডহীন ধড়। রক্তক্ষয়ী সেই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয় নতুন সমাজ। আজু মৃধাদের ধড় থেকে বেরিয়ে আসা রক্তে কীর্তিনাশার পলি মিশে তৈরি হবে উর্বরা ভূমি। আজকের চাঁদেরা সেখানে ফসল ফলাবে। নিষ্ফলা মাটিতে জন্ম নেবে জীবনের ফসল। এই চাঁদ তাই এমন এক লখীন্দরের জন্ম দেবে যাকে লোহার চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী করে রাখা যাবে না। এই লখিন্দর বড় হবে খোলা আকাশের নিচে গাছের উন্মুক্ত তলায়। মনসামঙ্গলের লখীন্দরের কাহিনীকেও সেলিনা হোসেন বিনির্মিত করেছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন নতুনভাবে। এইভাবে বিশ শতকের হতাশাগ্রস্ত বিপন্ন জাতির কাছে চাঁদের এই শক্তি সার্ব্বজনীন হয়ে উঠেছে। এমন এক চাঁদ বণিকের আহ্বান করেছেন উপন্যাসের নায়ক চাঁদ, যার ভয়ে মনসা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তাই এখানে সমালোচক প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন—

> ‘‘প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির ভয় নয়, বিশ শতকের ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ নয়, চাঁদ এখানে আধুনিক মন ও মননের দৃঢ় ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার অভাবনীয় সাহস ও গভীরতর সমাজবোধ প্রতিষ্ঠা করেছে নিজের মতো করে। মনসামঙ্গলের লখিন্দরের মতো জড়তায় আচ্ছন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করা ও অপরের করুণায় বেঁচে ওঠা অসহায় সন্তানের জন্ম দেবে না চাঁদ ও সাকিনা, তাদের লখিন্দর আজু মৃধাদের বেড়ে ওঠাকে রুখবে, চম্পাইগঞ্জের মাটিকে উর্ব্বর করে তুলে রাশি রাশি ফসল ফলাবে।’’[১১]

উপন্যাসে সর্পের উপস্থিতি সরাসরি দেখা যায়নি। তবে সর্প সমস্ত উপন্যাসটি জুড়ে রয়েছে। সর্প চাঁদের জীবনে বিশাল ভূমিকা নিয়েছে। সর্পরূপী আজু মৃধাই চাঁদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাই চাঁদ এই নিয়ন্ত্রণকে অতিক্রম করেছে নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে। লেখিকা মনসামঙ্গলের কাহিনির মধ্যে দিয়েই অগ্রসর হয়ে তৈরি করেন নতুন আর এক কাহিনী। সেলিনা হোসেনের কথাসাহিত্যে পূর্ববঙ্গের গ্রাম, জনপদ, মাঠ-ঘাট-প্রান্তর, সমাজ-সংস্কৃতি প্রভৃতি পরিবেশে ও সমাজ -সমস্যার প্রসঙ্গ এসেছে বারে বারে। তিনি বিশ শতকের পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের যন্ত্রণা, অবক্ষয় ও হতাশাকে অনুভব করেছেন নতুনভাবে। পাশাপাশি এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রাতিষ্ঠিত করে সমাজ গঠনের সম্ভাবনাকেও ভাষারূপ দিয়েছেন। বাংলাদেশ গড়ে ওঠার কালপর্বে তাই চাঁদের মতো দৃঢ়, ব্যক্তিত্বময়, জেদি, স্বপ্নশীল, সাহসী ও শক্তিমান মানুষের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি— এই সত্যটিকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন 'চাঁদবেনে' উপন্যাসে। এইভাবে প্রচলিত মনসামঙ্গলের পৌরাণিক কাহিনীকে গড়েছেন নিজের সময়ের বাস্তব ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে। সেদিক থেকে সেলিনা হোসেনের 'চাঁদবেনে' বাংলা সাহিত্যের একটি ব্যতিক্রমী সৃষ্টি, পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে তৈরি হওয়া একটি আধুনিক উপন্যাস।

মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের চম্পক নগরের বণিকশ্রেষ্ঠ চাঁদ সদাগরের ও দেবী মনসার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে বিশ শতকের শেষের দশকে ১৯৯৩ সালে লেখা আরেকটি উপন্যাসের সন্ধান পাই আমরা। সেটি হল বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কথাকার **অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'চাঁদবেনে'** উপন্যাস।

স্বাধীনতা উত্তরকালে পঞ্চাশের দশকে আধুনিক বাংলা উপন্যাসে অমিয়ভূষণ মজুমদারের আবির্ভাব (২২শে মার্চ, ১৯১৮ - ৮ই জুলাই ২০০১) এক নবতর অধ্যায়ের সূচনা করে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের যাঁরা স্বাতন্ত্র্যদীপিত কথাকার; অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশ ও অসম শিলচর প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষের জীবনালেখ্য তাঁর কথাসাহিত্যের অন্যতম বিষয়। এছাড়া স্বাধীনতা, দেশভাগ, জাতিদাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা ও মানবিক চেতনার অবমূল্যায়ন তাঁর সাহিত্যে বারে বারে ছায়া ফেলেছে। সেই সঙ্গে প্রাচীন ইতিহাস ও মিথও হয়ে উঠেছে তাঁর কাব্যবিষয়।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নীলভুঁইয়া' (১৯৫৫) যার পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ 'নয়নতারা' রূপে ছাপা হয়। যদিও অন্যতম এপিক উপন্যাস 'গড় শ্রীখণ্ড' ১৩৬০ সালে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্যান্য রচনাগুলির মধ্যে 'দুখিয়ার কুঠি' (১৯৫৯),

'নির্বাস' (১৯৫৯), 'উদ্বাস্তু' (১৯৬২), 'মহিষকুড়ার উপকথা' (১৯৮১), 'বিলাস বিনয় বন্দনা' (১৯৮২), 'রাজনগর' (১৯৮৪), 'মধু সাধুখাঁ' (১৯৮৮), 'ফ্রাইডে আইল্যাণ্ড অথবা নরমাংস ভক্ষণ এবং তাহার পর' (১৯৮৮), 'বিবিক্তা' (১৯৮৯), 'চাঁদবেনে' (১৯৯৩), 'বিশ্বমিত্তিরের পৃথিবী' (১৯৯৭) ইত্যাদি উপন্যাস পেয়ে থাকি।

ইতিহাস ও পুরাণের নবনির্মাণে রচিত তাঁর দু'খানি উপন্যাস পেয়ে থাকি আমরা—

১. মধু সাধুখাঁ (১৯৮৮)

২. 'চাঁদবেনে' (১৯৯৩)

বাস্তব অভিজ্ঞতা, রাজনীতি সঙ্গে কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, চিত্রকলা অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে দেখা যায়। জ্ঞানের জগৎ ও কল্পনাশক্তি মিশিয়ে তিনি জীবনের বাস্তবতা নির্মাণ করতে চান। ইতিহাস, পুরাণ-বাস্তবতা এবং মিথকে একত্রিত করে রচিত করেছেন তিনি 'চাঁদবেনে' উপন্যাসে। প্রাগাধুনিক রচনা অবলম্বনে বর্তমান অস্থিরতাময় সময়ে জীবন জিজ্ঞাসাকে, চরিত্রের জটিলতাকে তুলে ধরেছেন। ঔপনেবেশিক আধুনিকতার প্রতি দৃঢ় প্রত্যাখ্যান ব্যক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্ আধুনিক পর্যায়ের বিস্তৃত আখ্যান গ্রন্থন পরম্পরাকে পুনরুদ্ধার করতে দেখা যায় তাঁকে। এক্ষেত্রে তাঁর 'চাঁদবেনে' উপন্যাসের নাম উল্লেখ করা যায়। উপন্যাসটি 'চতুরঙ্গ' ও 'বসুধারা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে। চারটি তরঙ্গ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত মোট ২৯টি অধ্যায়ে সুবৃহৎ এই উপন্যাস পুরাণ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য নির্ভর এক সাহিত্য। অধ্যায়গুলি নিম্নে দেওয়া হল—

প্রথম তরঙ্গ :

১. সমতটের বসুবণিক,

২. মধুলিট জাহাজ,

৩. পক্ষধরের গল্প

৪. চাঁদের জাহাজ মধুলুব্ধা

৫. সমতটের যৌবন,

৬. শিব ও সর্প

৭. অন্য বাণিজ্য, অন্যপথ

৮. ধর্ম সুরা ও ক্রীতদাস

৯. এক অবিশ্বাস্য বাণিজ্য যাত্রা

১০. বদরিফল ও অলৌকিক তক্ষক

১১. নাগরী সমতট

১২. সুরা ও আলো

১৩. বিপর্যস্ত পণ্ডিত ও বংকদেশের গল্প

১৪. ভগ্নশিরা যক্ষ এবং রাজা জম্বুবান।

দ্বিতীয় তরঙ্গ:

১৫. এক দশকের স্বর্ণ হেমন্ত

১৬. জনৈকার জন্য

১৭. সে এক চিত্রাপির্তা

১৮. কাম্পিল্যর আম্রপালী,

১৯. অলৌকিক সর্পগুলি এবং শ্বেতময়ূর

২০. ব্যস্তসমস্ত সমতট

২১. বিচিত্র-মানুষেরা এবং অন্য এক পক্ষধর

২২. বৃহত্তম সিন্ধু শকুন ও রসিক রাক্ষসেরা,

২৩. অন্ধকার সুরা-আমোদিত গর্ভগৃহ ও ভাগ্য

তৃতীয় তরঙ্গ:

২৪. বণিক, নটিনী ও সন্ত

তরঙ্গ ভঙ্গিল:

২৫. ইন্দুধর পর্ব

২৬. বিদূষক ও বিষ্কম্ভক

২৭. অরিমত্ত পর্ব

২৮. শূরসেন পর্ব

২৯. শান্তিপর্ব

লেখক মনসামঙ্গলের কাহিনিকে স্থাপন করেছেন বিস্তৃততর ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। তবে মনসামঙ্গলের কাহিনি নিলেও তিনি নবম থেকে দশম শতাব্দীর সময়ের ইতিহাস-পালযুগের শেষ পর্ব ও সেনযুগের সূচনাপর্বের মধ্যবর্তীকালীন অরাজকতাময় সময়কে উপন্যাসের কেন্দ্রে দাঁড় করিয়েছেন। এমনকি, পল্লব-চোল যুদ্ধ প্রসঙ্গও এসেছে। উপন্যাসের কাহিনী

বঙ্গদেশ থেকে দক্ষিণ ভারতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষ ও প্রাচ্যের দেশ সমূহ তথা পূর্ব দ্বীপপুঞ্জ, ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন প্রদেশের ভৌগোলিক ক্ষেত্র, সেখানকার জনপদ ও সমাজ ইতিহাস লেখক তুলে ধরেছেন উপন্যাসে।

উপন্যাসের প্রথমেই আমরা পাই সমতটের অধিবাসী চন্দ্রশেখর বসুর কথা। সেই সঙ্গে সমতটের সুচারু ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বর্ণনা, যা তৎকালীন সময়ের ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলে উপন্যাসে। সিংহল থেকে বেরিয়ে একদল সিংহ বংশীয় বাঙালি বণিক বায়ু ও সমুদ্রস্রোতের আনুকূল্যের দরুণ মূল ভূখণ্ডের উপকূলে একটা ছোট উপনিবেশ গড়ে তোলে। যার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে পাহাড়। আর চম্পাবতী নামে গভীর খাড়ি সমেত নদী মধ্য সমতলকে দ্বি-খণ্ডিত করেছে। ঔপনিবেশিক নগর চম্পক বা চম্পা। প্রসিদ্ধতর এই চম্পার বন্দর থেকে এই বণিকগোষ্ঠীরা পশ্চিমে—সিংহল, কেরল, ভৃগকচ্ছ, আরব, মিশর এবং পূর্বে কঙ্গোদ, কলিঙ্গ, বঙ্গ, সুবর্ণভূমি, স্বর্ণদ্বীপ, কম্বুজ, চম্পা, চীন দেশে বাণিজ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলতেন। এই দুই বাণিজ্যপথের মাঝামাঝি জায়গায় ছিল চম্পক নগর। জৈন সন্ত-পণ্ডিতদের সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি তামিল কবিদের শিবগাথা এসব উপনিবেশে প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত বহুল, পালিমিশ্র অবহট্টবাসী ছিল সমতটের অধিবাসীরা। এই নগরের বৃদ্ধি ছিল দ্রুতগতি সম্পন্ন ও সুনিয়ন্ত্রিত। চন্দ্রশেখর বসু অষ্টবসুদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হলেও পিতৃপুরুষের সম্পত্তি, রূপসী স্ত্রী স্বর্ণকায়া সনকা থাকায় সে ছিল সৌভাগ্যের অধিকারী। পিতা পারিবারিক বাণিজ্যতরী হারিয়ে শোকে ও আশাভঙ্গে অকালে গত হলে চাঁদবেনে সেই জাহাজগুলি পুনরায় নির্মাণ করে এবং জাহাজের সংখ্যা বাড়িয়ে বাণিজ্য যাত্রা করে। তবে শোনা যায়, প্রথমবার সাফল্যলাভ করলেও পরের বার সাতখানা জাহাজ খুঁইয়ে নিঃস্ব হয়ে বাড়ি ফেরে। প্রথমবারে সে তাম্রপর্ণীর মুক্তা ও কদম্বের হাতির দাঁতের অলঙ্কার নিয়ে স্বর্ণদ্বীপে গিয়েছিল। দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ ছাড়াও খাস বরেন্দ্রের কৃষ্ণদুকুল ও দিগনগরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কার্পাস শাড়ি এনেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার একেবারে নিঃস্ব হয়ে ফেরে চাঁদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে (মধুলিট জাহাজ) চন্দ্রশেখরের তৃতীয় বৃহত্তর জাহাজ মধুলিট প্রস্তুত। অধ্যক্ষ পক্ষধরের অধীনে প্রধান মাঝি অথবা কাণ্ডারী গনা সহ চাঁদপুত্র বিজয় ঘোষ সুমদ্রযাত্রায় পাড়ি দেয়। মধুকরের অধ্যক্ষ মহানাদ এবং মধুপের অধ্যক্ষ মন্মটের মতো পক্ষধরকে চন্দ্রশেখর পাড়ি দিতে উৎসাহ দান করে। অনেকদিন ধরে মহাচীন যায়নি বলে পক্ষধরকে বলে। সেখান থেকে সুদৃশ্য অভূতপূর্ব-সুন্দর পানপাত্র আনার কথা ভুলে গেলে হবে না। পক্ষধরকে তাই যাত্রা করার জন্য

আহ্বান জানায়। বাণিজ্যযাত্রার পথ সে পক্ষধরকে জানিয়ে দেয়। বঙ্গোপসাগরের বৃত্তচাপ অনুসরণ করে কুলবাহী হয়ে মালয় উপদ্বীপ, শ্যাম, কম্বুজ, আন্নমচম্পাকে বেষ্টন করে মহাচীনের কিত্তচাত্তকে স্পর্শ করতে পারবে। সেখানে ভারতীয় বণিকদের ও শ্রমণদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। সাগরের যাত্রায় আরেকটি অন্য পথের কথা বলে। মহাচীনের উপকূল থেকে সরে সোজা দক্ষিণে নেমে যবদ্বীপের মধ্যবিন্দুকে স্পর্শ করা যায়। মধুলিটের এবারের সমুদ্রযাত্রার সব চেয়ে বড় সার্থকতা হয়, মালয় উপদ্বীপ থেকে মহাচীন এই বিস্তীর্ণ বিচিত্র দ্বীপ ও দেশে সংগঠিত মহাদেশের সঙ্গে বণিকপুত্র বিজয়ঘোষের সংযোগ ঘটানো। রাজন্যবর্গ, অভিজাতবর্গ অথবা বণিকশ্রেষ্ঠ -সম্প্রদায়ের সঙ্গে কুশল বিনিময়, উপহার বিনিময়, কার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে চন্দ্রশেখর বসুর অথবা তাঁর পূর্বপুরুষের বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল, তা খুঁজে বার করে সম্বন্ধটাকে পুনরায় দৃঢ় করে। কম্বুজ সম্রাট বিজয় ঘোষ সর্বজয়ীর একখানি করে বাণিজ্যপোত বিনা শুল্কে, তাঁর রাজ্যের বন্দরে বাণিজ্য করতে দেয়। যবদ্বীপের শ্রেষ্ঠী অদুলবিক্কমের গৃহে তিনদিন তিনরাত অবস্থান করে। বিক্কমের দ্বিতীয় কন্যা ঊনষোড়শ বর্ষীয়া সুবন্নপদুমার সঙ্গে প্রেমালাপ হয়। যাত্রার সময় শান্তশীল, বিনয়পালের মতো ত্যাগী, অনুসন্ধানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা হয়। উপকুল থেকে সমদূরত্বে থেকে দক্ষিণাবর্ত সমুদ্রপ্রবাহ, উৎসাহিত জোয়ারের উত্তরমুখী অগ্রগতি, উপকূলমুখী সমুদ্রবায়ু— তিন বলকে নিজের প্রয়োজনে লাগিয়ে দাম্ভিক ময়ূরপঙ্খী মধুলিট এয়োদেশীর আলোয় গলুইয়ের পিতলের অলঙ্করণ ঝলকাতে ঝলকাতে উত্তরমুখে এগিয়ে যায়। সে এক বছর সময় ধরে উত্তর-পূর্বে চীনকে স্পর্শ করে দক্ষিণ ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড, মালয়, সুমাত্রা, যব ইত্যাদি দ্বীপ ছুঁয়ে ছুঁয়ে অবশেষে সুমাত্রার উত্তর-পশ্চিম কোণ ঘেঁষে, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জকে পূর্বে রেখে সেক স্টান্ট, কম্পাস, দূরবীক্ষণ, ক্রোণোমিটারের সাহায্য ছাড়াই সাগরদ্বীপকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে এই জাহাজ একসময়ে সমুদ্রেই হারিয়ে যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে পক্ষধরের গল্পে শোনা যায় চাঁদবেনে স্বর্ণকায়া সনকাকে নিয়ে সমুদ্রযাত্রা করে। প্রবল আকাশ বিদীর্ণ ঝড়, শিলাবৃষ্টিতে চাঁদের জাহাজ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়, সেই সঙ্গে সনকাও হারিয়ে যায়। এই ঘটনার চারবছর পরে চাঁদ একটি মাত্র জাহাজ নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসে। এই পুরনো মধুলর্দ্ধা জাহাজের জীর্ণাবশেষ দিয়ে সে নতুন মধুলিট তৈরি করে। পরে মধুলর্দ্ধা জাহাজ নিয়ে কোন্ননগরে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে নগর-নায়িকা ক্ষিরোদ সম্ভবার ভবনে যায়। পরে নটী লীলালতিকার গৃহে যায়। নটী লীলালতিকার সঙ্গে চটুল আলাপচারিতায় ব্যস্ত হয়। শেষে চিত্রকর চারুদত্তের ভৈরবীর চিত্র অঙ্কন এবং সেই সূত্রে চাঁদ অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ভৈরবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং ভৈরবীর সাহায্যে তাঁতী সংগ্রহ করে।

এখানে চাঁদ ছলনা করে তাঁতীদের নিয়ে আসে। চতুর্থ অধ্যায়ে দেখি চাঁদকে ভৈরবী দাসব্যবসায়ী বলে অভিযোগ জানায়। এই ভৈরবীর মধ্যে চাঁদ স্ত্রী সনকার ছায়া অনুভব করে এবং ভৈরবীকে প্রেম নিবেদন করে। শেষে এই ভৈরবী ও সনকা একাকার হয়ে যায়। চন্দ্রশেখর বসুর ছলনা বুঝতে পারলে হলা ভৈরবী আত্মহত্যা করে এবং পাঁচ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া সনকার আবির্ভাব হয়। ভৈরবীপুত্র সাগরকে সনকা কোলে তুলে নেয়।

পঞ্চম অধ্যায়ে সমতট নগরের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। নগর প্রধান শেখর সেন, মটুলিটের শাসন পরিচালক মণিভদ্র, জনপদ প্রধান মহাস্থপতি, স্থাপত্য বিশারদ চিত্ররথের কথায় উঠে আসে উপন্যাসে, সেই সঙ্গে বণিক ইন্দুধবের কথাও আমরা পাই। বিত্তবান হলেই মানুষ প্রাসাদ ইত্যাদি তুলে থাকে। আর বহুদিন থেকে সেসবকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুদৃশ্য করার চেষ্টাও হয়ে আসছে। চিত্ররথের সময়ে নগরকে আগে সুশোভিত করার হাওয়া এসেছিল। অভিজাত বণিকশ্রেণী বাদ দিয়ে সম্পন্ন আদিবাসী, বর্ণসঙ্কর, আদিবাসী, মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের মধ্যেও তার প্রভাব ছিল। এইসময় সমতটের স্বর্ণযুগ ছিল। আর এই স্বর্ণাগমের মূলে ছিল মহানায়ক চন্দ্রশেখর। এইসময় আরেক প্রতিপত্তিযুক্ত বণিক ছিল ইন্দুধব। বসুবণিকদের অন্যতম এবং চন্দ্রশেখরের আবাল্য সুহৃদ-সখা শুরসেনের সে ভগ্নিপতি। চন্দ্রশেখর-শূরসেনের সঙ্গে এই ইন্দুধবের ছিল অসম প্রতিযোগিতা। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়ে চন্দ্রশেখরের পক্ষভুক্ত বণিকশ্রেণী হলেন রহস্যপটু, শিল্পরসিক, দ্বিতীয় চাণক্য মণিভদ্র, অধীরগামী, বাগ্মী, অর্বুদস্বর্ণের পতি সোমদত্ত, রুদ্রকর্মা, বিপুলদেহ বজ্রদন্ত যার চার চার খানা জাহাজ খনিজ বহন করে সমস্ত ঋতুতে সমুদ্র লঙ্ঘন করে কূটবুদ্ধি হরিষেণ; স্থিতধী কামন্দক; গাণিতিক বিরূপাক্ষ; বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখে সমতটের সমগ্র বাণিজ্যের হিসেবে পড়ে অমিততেজ বুক্ক। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে বন্ধু শূরসেন ও দময়ন্তীর সঙ্গে আলাপচারিতায় দেখা যায় চাঁদকে। সেই সঙ্গে দুই বন্ধুর সুরাপানও চলতে থাকে। 'শিব ও সর্প' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা প্রথমে চাঁদ ও সনকাকে দেখতে পাই।

চাঁদ পুনরায় বাণিজ্যযাত্রার জন্য নতুন জাহাজ তৈরি নিয়ে ব্যস্ত। সঙ্গে জাহাজডুবির জের তত সহজে মেটার নয়। মৃত সেই নাবিক, মাঝি-মাল্লাদের পরিবার পরিজনদের সঙ্গে দেখা করে, সান্ত্বনা দেয় এবং অন্য সাহায্যও করে। বন্ধু শূরসেনের সঙ্গে দপ্তরে দেখা করে গোপনে পরামর্শ করে। পরামর্শে স্থির হয় বণিকদের নিয়ে সভা ডাকার। সভার নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দিয়ে চাঁদ তার জাহাজে করে আনা মাটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সপ্তম অধ্যায়ে শূরসেনের উদ্যানবাটীতে চাঁদের সঙ্গে বৃদ্ধ মণিভদ্র, সোমদত্ত , বুক্ক, দর্ভপানি, প্রৌঢ় হরিষেণ, ওদন্ত সেনের পুত্র বজ্রদন্তের মধ্যে

নতুন রকম ধাতু আবিষ্কার নিয়ে আলোচনা হয় যা মাটির সঙ্গে জাহাজের খোল বোঝাই করে চাঁদ সমতটে নিয়ে আসে। এখানে ধাতুর প্রকৃতি, বাণিজ্যিক উপকারিতা ও অভিনবত্ব নিয়ে বণিকগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা হয়। চাঁদের চেষ্টায় শূরসেন মণিভদ্র, সোমদত্ত, রুদ্রকর্মা, বজ্রদন্ত, হরিষেণ, কামান্দক, বিরুপাক্ষ, ইন্দুধব প্রমুখ ব্যক্তিত্ব নতুন উদ্যমে জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য যাত্রা শুরু করে। চাঁদ এই সময় একই সঙ্গে তিনখানা জাহাজ কেনে— সেগুলি হল মধুকর, মধুলিট ও মধুপ। বাণিজ্য সম্পর্কে তাঁর ছিল অফুরন্ত উদ্যম ও গভীর নিষ্ঠা ও দূরদর্শিতা। প্রখর ব্যবসায়ীবুদ্ধির অধিকারী চাঁদ নানাভাবে বাণিজ্যের নতুন সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করে। কখনো অন্য দ্বীপ থেকে মাটি নিয়ে এসে বিক্রয়, কখনো ধাতু সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। লোহাকে রূপায় পরিণত করার কৌশলও অনুসন্ধান করে সে। কখনো বা চীনা, শুক অথবা দিগনগরী বা কাঞ্জীপুরমের বস্ত্র সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন দ্বীপে রপ্তানী করেন। এইভাবে বাণিজ্যের নতুন নতুন দিক আবিষ্কারের চেষ্টা করে। এমনকি খনিজ বাণিজ্যে যৌথমূলধনী ক্ষেত্রটিকেও চাঁদ গুরুত্ব দেয়। তাঁর পরিকল্পনা ছিল— এতে এগারোটি জাহাজ নিযুক্ত করতে হবে। চাঁদের নিজের থাকবে দুটি এবং অন্যান্যদের একটি করে । এরই মাঝে চাঁদ পুনরায় বাণিজ্যে যাত্রা করে। সমুদ্র ঝড়ের মধ্যে পড়ে বিপর্যস্ত হন। পরে কন্যাকুমারী অন্তরীপ হয়ে ফিরে আসে। এরপর তিনি সমতটের প্রান্তে অবস্থিত সাঁওতালি পাহাড়ে নির্মাণ করে এক বৃহত্তর সুন্দর প্রাসাদ। ছোটো বড়ো সাতটি উপত্যকায় সাজানো সাঁওতালি পাহাড়ের পরিবেশ শীতল, স্নিগ্ধ, চন্দনগন্ধে সাজানো ও মনোরম। এখান থেকেই নেমে এসেছে একটি পাহাড়ি ছোট নদী। সমতলে তার নাম সুবর্ণমুখী বা চম্পাবতী।

চাঁদ ও সনকা এই সাঁওতালি পর্বতের শীতল ধূলিহীন, চন্দনগন্ধযুক্ত ভূমিজ বায়ুর টানে সেখানে মাঝে মধ্যেই বেড়াতে যায়। সেখানে মনসিজ গাছের ঝোপের চারিদিক ঘিরে পাঁচ-ছয়জন মানুষ খোলা আকাশের নীচে মনসা পূজা করে। বণিক বংশের মঙ্গল কামনায় সারি নামক সনকার এক ক্রীতদাসী এই মনসা পূজা করে। চাঁদের মতে এই সাপ কুটিলতা, ক্রুরতা আর বিষের প্রতীক। মাটিতে মিশে চলে কপট কোমলতা আর বিনীত ভাব দেখিয়ে। মানুষ অসতর্ক হলেই ছুবলে দেয়। পূজা মানুষের অনুভূতিকে উদার ও মহৎ করে। তা হয় সরীসৃপের ধ্যানে। আদিবাসীদের মনসাগাছের নিচে প্রদীপ ও ধূপ জ্বালিয়ে মনসাপূজা করাকে চাঁদ সমর্থন করে না। কিন্তু সনকা এই সাপকে দাস গোষ্ঠীদের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করে। মূর্খ ও মূক মানুষের নিজের অনুভূতি এই পূজার সঙ্গে জড়িত। বণিকপুত্র বিজয় ঘোষকে নিয়ে পক্ষধর সমুদ্রযাত্রা করে। পক্ষধর বিজয় ঘোষ, দণ্ডপানি, শান্তশীল ও কুমার বিনয় পালকে নিয়ে চাঁদের সপ্তডিঙা তলিয়ে যাওয়ার যে পূর্ব ঘটনা বলে তা

বিজয়ঘোষকে নৌচালানো শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে বংশের ইতিহাস জানানোর অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে। বন্ধু শূরসেন ও তার স্ত্রী দময়ন্তীর উপস্থিতি চাঁদের জীবনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। চাঁদ শূরসেন, দময়ন্তীর আলোচনায় উঠে আসে দেশ, জাতি, রাষ্ট্র, সাহিত্য শিল্প ও সভ্যতার নানা দিক।

উপন্যাসের দ্বিতীয় তরঙ্গের সূচনা হয়েছে সমতটের স্বর্ণযুগের বর্ণনার মধ্য দিয়ে। দশ বছর যুগব্যাপী সোনার হেমন্ত সমতটে। হেমন্তের সোনা প্রবাদে শস্য হলেও সমতটের সোনা সেই অভূতপূর্ব মৌলিক বাণিজ্য। ঔপন্যাসিক এই স্বর্ণযুগের বর্ণনা করেছেন এভাবে—

> ''প্রথম দশ বৎসরেই সমতটে যদি একশো জাহাজ এসে থাকে, অন্যান্য ধাতু এসেছে চতুর্গুণ। আর এই দশ বৎসরে খনিজ-অঞ্চলেও শুধু ধাতু শ্রমিক, ধাতু কারিগর নয়, ধাতুবিশ্লেষক নামে এক শ্রেণীর পণ্ডিত সৃষ্টি হয়েছে সমতটে। তারা উত্তাপ আর অম্লের সাহায্যে পাথর থেকে ধাতু, এক ধাতু থেকে অন্য ধাতু পৃথক করে।''[১২]

বাণিজ্যযাত্রার জন্য চাঁদ মধুভৃঙ্গ ও মধুতপ্ত নামক জাহাজ তৈরি করেন। চম্পকনগরেও তৈরি হয়েছে বৃহত্তর, সুদৃশ্য এক অট্টালিকা। এই প্রাসাদের ঐশ্বর্য সুখ ও বিলাস-ব্যসনের মধ্যেও চাঁদের মন অস্থির। আলাদা একটা ভয়-ভীতি তাঁর মধ্যে আসে। তাই সে বন্ধু শূরসেনের বাড়ি থেকে ফিরে এসে হিসেব ঘরে প্রদীপের আলোয় বাতায়নের চৌকাঠ পর্যন্ত উঁচু এক ধূসর খয়েরি ফণাযুক্ত সাপ দেখে আতঙ্কিত হয়। সাপটি যেন সেই মুহূর্তেই জানলা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে গিয়ে প্রচণ্ড শব্দে আকাশে উঠে যায়। তার জ্বলন্ত চেরা জিভ বিদ্যুতের মতো আকাশকেই ভাগ করতে লাগল। আর তারই ফলে প্রবল ঝাপটায় ঘরের প্রদীপ নিভে যায়। পূর্ণিমার আকাশে বৃষ্টি নামে। চাঁদের মতে এটি ছায়ামাত্র। সে হা হা করে হেসে সাপের দিকে আঙুল তুলে দেখায়— ''দেখো, সনকা, দেখো, চাঁদকে ভয় দেখায়, চাঁদকে।''[১৩] পরে চাঁদ নিজেকে সামলে নিয়ে এই দৃশ্যকে অলৌকিক নয় বলে উড়িয়ে দেয়। এটি এক রকমের বৃষ্টি, উত্তাপ সঞ্চালনে হয়। বিদ্যুৎ চমকায়, বজ্র পড়ে। চাঁদ একসময় রাত্রে বীভৎস স্বপ্ন দেখেন। সেই দিন ছিল প্রচণ্ড গরম। ঘুম না হওয়াতে বিরক্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন চাঁদ স্বপ্নে 'হেন্তাল' বলে চিৎকার করে। মনে হয়েছিল শ্মশানের নিস্তব্ধতায় নদীর ধারে আলো-অন্ধকারের রহস্যময়তায় প্রাচীন হিজল গাছটা বীভৎস হয়ে উঠেছে। তার পত্রহীন ডালগুলো বিস্তৃত হয়ে যেন ডাইনির মতো দাঁড়িয়েছে। সেই গাছের ভয়াবহ অন্ধকারময় কোটর থেকে আর্ত চিৎকার করে বেরিয়ে আসছে একটা পাখি। আর একটা কুৎসিত দর্শন সাপ পিচ্ছিল গতিতে ফণা লুকিয়ে সেখানে ঢুকতে

উদ্যত হয়েছে। তখনই অসহায়ের মতো চিৎকার করতে করতে ছুটে আসার অনুভবে চাঁদের ঘুম ভেঙে যায়। উনিশ অধ্যায়ের শেষে, বন্ধু শূরসেনের মতে মনসাপূজা বা সর্প যদি সাধারণ কৃষ্ণবর্ণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, পদপিষ্ট অনুভূতির প্রতীক হয় তাহলে সেগুলি একসময় বিষ সঞ্চয় করে বিষাক্ত ও ক্রূর হয়ে উঠতে পারে। দময়ন্তীর গল্প মতে সেকালে সাপকে ঐশ্বর্য আদায়ের শক্তি রূপে ধরা হত। কিন্তু আরো লোভ, আরো ঐশ্বর্য আদায় করতে গেলে বিষ উগরে পড়ে। উপন্যাসের সতেরোতম অধ্যায়ে দেখি এগারো বছর পেরিয়ে যাবার পরে পুনরায় যৌথ বাণিজ্যকে নতুনভাবে কাজে লাগানোর জন্য মণিভদ্রের বাড়িতে হরিষেণ, সোমদত্ত, দর্ভপানি, বজ্রদন্ত, বুক্ক, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি বণিকদের মধ্যে আলোচনা হয়। উপন্যাসে কলিঙ্গ বণিক বাক্‌পতি, ইহুদী সুরা বণিক সলেমান, সুলতান বণিক বিণ চাচ ও বমিয়ান আকমদ চাঘতাই, জিড্ডার বণিক আব্বাস, সুমালির কথা জানা যায়। সেই সঙ্গে বসুশ্রী পুত্র হলায়ুধ ও শূরসেন পুত্র শাতনীকের বিণ চাচের সঙ্গে উত্তর ভারতের রাষ্ট্র, পাল, প্রতিহার এই তিন সাম্রাজ্যে বাণিজ্যে যাওয়ার কথা শোনা যায়। চাঁদপুত্র সাগর বাণিজ্যে গিয়ে পিতার মর্যাদা রক্ষা করতে ইচ্ছুক। সাধারণ লোকে যে পিতাকে লোভী, নির্বোধ ও ঘাতক বলে এবং বিনা কারণে জাহাজগুলোকে সমুদ্রে পাঠিয়ে অধ্যক্ষ ও নাবিকদের হত্যা করেছে— পিতার এই অপবাদ ঘোচানোর জন্য, মিথ্যা রটনা দূর করার জন্য সমুদ্রে যেতে চায়। সে নিজে সমুদ্রে গিয়ে প্রমাণ করতে চায় শ্রীমন্ত, রুদ্রসেন, কৌমিলরা যারা লোহিত সাগরে গিয়েছিল কুন্ডীর জাহাজে, পুরন্দর যে মধুতৃপ্ত নিয়ে গিয়েছিল আরব সাগরে- তারাও চাঁদের প্রিয় ছিল। সে পিতার যোগ্য পুত্র হতে চায়, সমুদ্রযাত্রাগুলো যে উদ্দেশ্যহীন ধ্বংস নয়— তা প্রমাণ করতে চায়। মধুকর, মধুপ, মধুবহ, মধুমক্ষী ও মধুভৃঙ্গ জাহাজ নিয়ে সাগরদত্তের বাণিজ্যযাত্রা এবং পুত্র সাগরের নিমজ্জিত হওয়া চাঁদের জীবনে ব্যর্থতা নিয়ে আসে। তাঁর হাহাকার ও মধুলিট জাহাজ নিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যাওয়া নিয়তির কাছে পরাজয় যেন। চাঁদ একবুক জলে নেমে মধুলিটের সাতহাঁড়ি ঘৃতমিশ্রিত অন্ন, একশত নারিকেল সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়। তখন তার চোখ দুটি যেন অস্তগামী সূর্যের মতো রক্তিম। সেই জীর্ণ মধুলিটেই উঠে এসেছিল চাঁদ। উত্তর-পূর্বী বায়ু তখন উত্তর-পশ্চিম বায়ু, প্রবল সমুদ্রস্রোতে পূর্বমুখী ছুটছে বামাবর্তে। বন্ধু উসমান ও বাপা দায়ুদকে ধন্যবাদ জানিয়ে দ্রুত কাণ্ডার-মঞ্চে গিয়ে উঠেছিল। দায়ুদ ও উসমান জাহাজ থেকে নেমে যাওয়ার সময় 'বাপা সাগর' বলে চাঁদের হাহাকার শোনা যায়। দায়ুদও নৌকায় নেমে গেলে উসমানের সেই দীর্ঘ নৌকার গলুই সমুদ্র ফেনার মতো আন্দোলন করে। দায়ুদের মতে সেই প্রবল বায়ু ও সমুদ্রস্রোতের মুখে যে হাল ধরে, তাকে আদমের সন্তান বলে মনে হয় না। সেই জরাজীর্ণ মধুলিট তারপর কোথায় গেল কেউ জানে না। যেমন করে

এক পিতা সাগরকে খুঁজেছিল, তেমন করেই বিজয়কে সমুদ্রে পাঠিয়ে এখন অনুশোচনায় তাকে খুঁজছে? সেই পাঁচ কার্ষপণের জাহাজ? শীতে, গ্রীষ্মে কখনই বা সমুদ্র প্রমত্ত নয়। চাঁদ হয়তো কালকে অতিক্রম করতে চেয়েছিল। তাই বন্ধু শূরসেনের মুখে শোনা যায়—

> ''ভাগ্য বলে কি কিছু আছে? এবার কি ভাগ্যকে প্রলুব্ধ করতে সে তার দরজায় আঘাত দিতে চাইছে? সে কি, অথবা, পালের রশি নিজের হাতে ধরে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে চায়?''[১৪]

তৃতীয় তরঙ্গে বিজয়ের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া চাঁদের জীবনে আরো ট্রাজেডি নিয়ে আসে। নিজে সপ্তসাগর পাড়ি দেয়; কিন্তু সেখানেও তার ব্যর্থতা। সমুদ্র তরঙ্গের ন্যায় জীবনের তরঙ্গও বহমান, তার কোন সীমা নেই, অনন্ত তার ব্যাপ্তি তার অপর তীরে কী আছে কেউ জানে না। সব ধর্মেই জীবাত্মা হোক, বা পুদ্গল হোক সব মানুষকে জীবন সমুদ্রে নাবিক হতে হয়। পিতা বিজয় ঘোষকে সর্বজয়ী নায়ক হতে বলেন। তাঁর কাছে কালের তরঙ্গভঙ্গ, লবণসমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ অপেক্ষা বেশি বিপজ্জনক ও ভয়াবহ মনে হয়। অথবা বেশি বিচিত্র। পিতার আশীর্বাদকে সফল করার জন্য নিজের মধ্যে এভাবে আত্মজিজ্ঞাসা উঠে আসে বিজয়ের। আত্মসংকটের মুহূর্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলে সে সমুদ্রের মধ্যে। বিনা মেঘের বজ্রের আঘাতে বিরূপাক্ষ ও ভৃঙ্গীবৎ চাঁদ 'ও বিজয়', 'ও বিজয়' বলতে বলতে তাঁর দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। প্রভাতে ও অপরাহ্নে, সায়াহ্নে, পাটাতনে ধীর পদক্ষেপে ঘুরে বেড়ায়। দভভপানির মুখে তাই ঔপন্যাসিক শুনিয়েছেন—

> ''পরিত্যক্ত জরাজীর্ণ মধুলিটে সপ্তসাগর চষে বেড়ানো, সে তো মূর্তিমান হাহাকারই। তার উদ্দেশ্য কি ছিল, সাগরদত্ত থেকে দুর্ভাগ্যকে নিজের দিকে আকর্ষণ করা? হায়, দেরী হয়ে গিয়েছিল যেন। তারপর থেকে বিজয় ঘোষ থেকে দুর্ভাগ্যকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতেই কি নতুন মধুলিটকে জরাজীর্ণ আর এক মধুলিট অনুসরণ করছিল? যখন ভাগ্য, বুঝলে, শ্রমণ বিজয়কে সে কোনো ভাবেই সার্থক আঘাত করতে পারবে না, তখনই এই চূড়ান্ত আঘাত তার চিরবৈরীকে।''[১৫]

চতুর্থ পরিচ্ছেদে তরঙ্গভঙ্গিলে পল্লব বংশের পঁচিশ বছর ধরে কুম্ভকোণমের মহাযুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। চোল পাণ্ড্য ও পল্লবের মধ্যে যুদ্ধ। নৃপতুঙ্গের মৃত্যুর পরে অপরাজিত অপ্রতিহত শক্তি লাভ করে। কিন্তু আটশো ছাব্বিশে আদিত্যচোল অপরাজিতকে হত্যা করে চোল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে নবম শতাব্দীর ইতিহাসকে বাস্তবায়িত করেছেন ঔপন্যাসিক। এই

কুম্ভকোনমের যুদ্ধ সমতটকেও প্রভাবিত করতে পারে। তাই আদিবাসী গোষ্ঠীসহ বণিকদের মধ্যে বৈঠক হয়। আরক্ষবাহিনী শক্তি, মায়াবাহিনী শক্তি তৈরি করা এবং সাঁতালি পর্বতের উপরে দূর্গ নির্মাণ, শূরসেনের তত্ত্বাবধানে নারী-শিশুদের সাঁতালি পর্বতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। যুদ্ধে ইন্দুধ্বব ও শূরসেনের মৃত্যুতে সমতটে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে সমতটের বসুবণিক চন্দ্রবসুর জীবনের করুণতম পরিণতি পরিলক্ষিত হয়। ভাগ্যের কাছে পরাজিত এই অর্ধদগ্ধ বলিষ্ঠ পুরুষ চন্দ্রবসুর জীবনের পরিণতি দেখানো হয়েছে। সর্বস্ব হারিয়ে চাঁদ নিঃস্ব হয়ে সমতটে ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়িয়ে পল্লবভরমের পথ অতিক্রম করে সমতটে ফিরে আসে। তবে নিজেকে অপরাধী মনে করে না সে। শুধু বন্ধু, অধ্যক্ষ, নাবিকদেরই সে বাণিজ্যে পাঠায় নি, প্রাণসম পুত্রকেও পাঠিয়েছে। সনকার কাছে তাই সে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলে—

> ''তাছাড়া সনকা, আমার পরিকল্পনায় কি ভুল ছিল? তুমি এ সবে আমার সঙ্গে একমতই ছিলে। মন্মট, মহানাদ, পুরন্দর, সৌতি, সুষেণের মতো অধ্যক্ষ, আর দেহরক্ষী হিসাবে সাতশত তারা। আর তারা লোহিতসাগরে না গিয়ে সুমালি আর অবিসিরাজ্যে ভারতীয় কার্পাস ভারতীয় পণ্য উৎপাদন কেন্দ্র করবে। বলো, তাই নয়? আর সাগর বলেছিল কাব্যই প্রমাণ অনেক সময়ে পুত্রদের নিজের যোগ্যতা দিয়ে প্রমাণ করতে হয়, কে তার জনক। দেখো আমি ভেবেছিলাম সুমালিতে ভারতীয় পণ্যকেন্দ্র স্থাপিত হলে, বংকই প্রমাণ সেখানে আরবি ইশায়ী সব বণিকই আসত, সেখানে বন্ধু আরবিদের দেখা মিলত। তখনই ভূমধ্য সাগরের উপকূলে যাওয়া সহজ হত।''[১৬]

ভাগ্য যে তার সাথ দেয় নি, কালের ঘোরাটোপে সে যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল তা নিজে বুঝতে পেরেছিল। তাঁর ক্ষেত্রে ভাগ্য কাপুরুষ হয়ে, সমাপতনের চেহারায় এসেছে। ঐরাবতের মতো এই ভাগ্য আর আসে না। এই দুর্ভাগ্যের সময়ে এমন কুষ্ঠী হয়েছে বারবধূও তাকে ঘৃণা করে। সমতটে ফিরে এসে কুম্ভকোনমের যুদ্ধে বন্ধু শূরসেনকে সহযোগিতা করে চাঁদ। বন্ধু শূরসেনের মৃত্যু এবং মনসাপূজক চারুদত্তের সঙ্গে কষায়বস্ত্রের সনকার আলাপ ও যোগাযোগ চাঁদের জীবনে হাহাকার নিয়ে আসে। চাঁদ 'সনকা, সনকা' বলে হাহাকার করে কাঁদতে লাগে। ডান হাতে বাঁ বুক এভাবে চেপে ধরে যে, যেখান থেকে চামড়া ছিঁড়ে রক্ত বেরোয়। কিন্তু এই চন্দ্রশেখরের যুক্তিতে মৃত্যু বলে কিছু নেই, মৃতুভয়ও তার ছিল না। তাই নিজের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সে নিজেই সম্পন্ন করে। পরে মুংলাকে জাহাজের অধ্যক্ষ করে পূর্ব পশ্চিম, উত্তরদক্ষিণ, উত্তরপশ্চিম জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

অনির্দিষ্ট পথে, অনির্দ্দিষ্ট যাত্রায় পা বাড়ায় এই 'চাঁদবেনে'। পক্ষধরের মুখে ঔপন্যাসিক চাঁদের এই পরিণতির কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে—

> ''সমতটের সেই চিতা তাহলে নিজের তত্ত্বাবধানে নিজের শেষ সংস্কার করে যাওয়া চন্দ্রশেখরের? জানিয়ে গেলেন, তার সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্বন্ধ রইল না? মধুকর নিয়েই বা একা তিনি কোথায় যাবেন? সেই ভূমধ্যসাগরেই কি আবার? কিংবা তাকেও পার হয়ে? অথবা একি নিজের খ্যাতি-অখ্যাতি প্রতিষ্ঠা সব কিছুকে দগ্ধ করে ভাগ্যের জন্য কিছু ছুড়ে দেওয়া।''[১৭]

এইভাবে চাঁদের মৃত্যু হয়েও সে মৃত্যুকে জয় করেছে। জীবনের তরঙ্গে তাঁর পরাজয় ঘটলেও নিজেকে থামিয়ে রাখেনি। সমুদ্রে অনির্দিষ্ট দিকে সে আবার পাড়ি দিয়েছে। তারই নির্দেশে পক্ষধরের তত্ত্বাবধানে চাঁদপুত্র লখীন্দর ও শূরসেন পুত্র শাতনীক পুনরায় মধুলিট জাহাজে সমুদ্রে পাড়ি দেয়। প্রায় দুশো হাত লম্বা মধুলিট। জলরেখা থেকে আঠারো-হাত উঁচু, পঞ্চাশ জোড়া দাঁড়ের তিন মাস্তুলে নায়-থাক পাল যুক্ত এই জাহাজের অধ্যক্ষ পক্ষধর। ময়ূরপঙ্ক্ষী নয়, ময়ূরের বড় বড় গোল চোখদুটি মাজাঘষায় ঝকঝকে। ফলে কখনো আকাশের, কখনো সমুদ্রের ছায়া ধরে সেই চোখদুটি কখনো চিন্তাশীল, কখনো উত্তেজিত, কখনো বা কুটিল। এই মধুলিট নিয়ে লখাই দক্ষিণে নেমে তাম্রপর্ণী হয়ে, পরে উত্তরপূর্বে এবং ব্রহ্ম অঞ্চলে যাবে, মালয়ে শ্রীবিজয়রাজ্যে যাবে সমতটে ফিরবার আগে। তাঁর পূর্বাঞ্চলে যাত্রা চন্দ্রশেখরের নির্দেশে। শাতনীক সমুদ্রে পাড়ি দেয় তার পিতার জারজ সন্তানদের সন্ধানে। সময় কোনদিন থেমে থাকে না। কোন একটি বিরাট সাম্রাজ্যে ধ্বংস হয়ে গেলে আবার নতুন সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটে। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় কুম্ভকোণভের যুদ্ধের শেষে পল্লব বংশের ধ্বংস ও চোল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

ঐতিহাসিক ঘটনা, যুদ্ধবিগ্রহ ও উত্থান পতনের কাহিনির মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে মনসামঙ্গল কাব্যের মিথ ও পুরাণকথা। ইতিহাস ও পুরাণ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে উপন্যাসে। মনসামঙ্গলের পুরাণের সরাসরি প্রয়োগ ঘটাতে পারেননি। কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে লেখক বিশ শতকে দাঁড়িয়ে উপন্যাস লিখছেন। বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্যিক জীবনযাত্রা অলৌকিক অন্ধকার ও মিথোলজিক্যাল রহস্য মিশিয়ে রূপদৃষ্ট কথাশিল্পীর মতো জীবনকে স্পর্শ করার চেষ্টা। এখানে অমিয়ভূষণ দেশীয় ঐতিহ্যের শিকড় সন্ধানী। পৌরাণিক আবহ থাকায় বাস্তবতার প্রশ্নগুলি বড় হয়ে উঠে অনেকসময়। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের মতো উপন্যাসে রয়েছে চাঁদ সদাগর, সপ্তডিঙা

মধুকর, চাঁদের পুত্রদের মৃত্যু, সমুদ্র ঝড়, সপ্তডিঙাসহ চাঁদের হারিয়ে যাওয়া সনকা, লখীন্দর, সর্পপূজা ইত্যাদি অনুষঙ্গগুলি। ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, পৌরাণিক বা আঞ্চলিক উপন্যাসেই অমিয়ভূষণের ইতিহাস প্রয়োগ অধিক সুপ্রযুক্ত এবং জীবন্তও। আধুনিক মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা, ব্যর্থতা, ট্রাজেডি এবং এমন এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মানুষ যে জীবনযুদ্ধে বা জীবন সমুদ্রে পাড়ি দিতে পারে, তা অঙ্কন করতে গিয়ে লেখক মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নবম-দশম শতাব্দীর আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে। এখানে বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্য তুলে ধরেছেন, কারণ এমন একজন বণিকের জীবনকথা অঙ্কন করতে চেয়েছেন যে ভূমধ্যসাগরে পাড়ি দিতে চেয়েছে, কালকে যিনি অতিক্রম করতে চোয়েছে। মনসামঙ্গলে আমাদের পরিচিত চাঁদবেনে চরিত্রের সঙ্গে দৈবীশক্তির লড়াই, সর্পদেবী মনসা ও সাপের অনেকটা প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিতি। মনসা চরিত্রের সরাসরি নামোল্লেখ না থাকলেও উপন্যাসে সর্পের উল্লেখ আছে অসংখ্যবার। আসলে বিশ শতকের যুগে দাঁড়িয়ে মধ্যযুগের মনসামঙ্গলের মতো দৈবনির্ভর কাহিনীকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে লেখককে নানা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। তবে মনসার প্রসঙ্গটিকে নানা যুক্তিবুদ্ধির সাহায্যে দাঁড় করিয়েছেন।

উপন্যাসের ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম 'শিব ও সর্প'। চাঁদ ও সনকা নগর ছাড়িয়ে যে শিব-পার্বতীর মন্দিরে যায়, সেখানকার বিগ্রহের পরিকল্পনা দেখে চাঁদের কাছে প্রশংসার বদলে নিন্দনীয় বলে মনে হয়। অনুচ্চ কণ্ঠে সে বলে ওঠে— ''ওটা তো জটা নয়, সাপ। সাপ কেন?'' তাঁর মতে, শিবের আকৃতি লিঙ্গরূপ হওয়াই ভালো এবং শিবের গলা পেঁচিয়ে বুকের উপর সাপ দেখে গৌরী সঙ্কুচিত। কিন্তু সনকার মতে, উর্বরাশক্তি সাপের জন্যই এই পৃথিবী সৃষ্টি, আমরা সৃষ্টি। এখানে চাঁদের সর্প-বিতৃষ্ণা দেখানো হয়েছে। কিন্তু সনকার কাছে সর্প ও শিব একাকার হয়েছে। দুইই যেন উর্বরা শক্তির প্রতীক। 'অলৌকিক সর্প' নামে উনিশ অধ্যায়ে কোন্নগরের নগরনায়িকা লীলালতিকার গৃহে সর্পপূজা দেখে অসন্তুষ্ট হয়েছিল চাঁদ। তার মনে হয়েছিল সর্প আসলে ঘৃণা ও ভয়ের বস্তু। সে কখনোই সর্পকে সহ্য করতে পারে না। দপ্তরের বাতায়নের দেওয়ালের কাছে চৌকাঠ পর্যন্ত উঁচু এক ধূসর খয়েরি সাপের রাগে ফণা তুলে কাঁপা, ফোঁপানো এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে চাঁদ বিচলিত ও বিহ্বল হয়ে পড়ে। তবে তৎক্ষণাৎ বিচলিত ভাব কাটিয়ে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে সাপকে ছায়া বলে উল্লেখ করে। আদিবাসীরা মানুষের মঙ্গলকামনায় এই মনসাপূজা করে থাকে। তবে চাঁদ এই মুহূর্তে মনসাকে কুটিলতা, ক্রুরতা, আর বিষের প্রতীক বলে। সনকার মতে কৃষ্ণবর্ণ মানুষের নষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা পদপিষ্ট অনুভূতির প্রতীক এই সর্প। দময়ন্তী সাপপূজাকে ঐশ্বর্য আদায়ের শক্তির

সঙ্গে সঙ্গে এক পুরাণের গল্প বলে— সর্প জন্মমাত্র গোপালের অহিছত্র, কিশোর গোপাল সাপের মাথায় নাচে। তক্ষশীলায় ঢোকার আগে এক গ্রাম্য-পূজকের কাছ থেকে যে পতঞ্জলির শ্বেতপাথরের মূর্তি পায় বিন চাচ, তার মাথার উপর সাপের পাঁচফণা। সেই সর্পপূজকের মতে সর্প মানুষের মধ্যেই অন্ধকাম রূপে থাকে। সেই অন্ধসর্পকাম থেকেই লোভ, লোভ থেকে ক্রোধ, সেজন্য বিষময় পাঁচফণা তার। আবার সেই অন্ধকাম না থাকলে মানুষের বৃদ্ধিই হয় না, যৌবনের গুণপনা আসে না। এই অন্ধকাম জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হলে তবেই তার বিষক্ষয় হবে। এই ঔপন্যাসিক সর্পসংক্রান্ত বিভিন্ন অর্থ তুলে ধরেছেন উপন্যাসে। তাঁর নিজস্ব ভাবনা চিন্তাগুলিই এক সাক্ষাৎকারে ব্যক্ত করেছেন, তা নিম্নে তুলে ধরা হল—

> "Libido কিন্তু Unconsious তো, মনের অংশই যেন মনসা। সেজন্যই তিনি শিবের আত্মজা। পরমজ্ঞান আত্মজা। তার মানে Libido is part of mind, super ego is part of mind সে জন্যই আত্মজা। এই মনসার পূজা করে। আমাদের শরীরের ওই যে বিষ— কাম, ক্রোধ, হিংসা—এই সমস্ত যে মূল শক্তি— Libido, যেটা নষ্ট করলে মানুষ যুবক হয় না, গোঁফ ওঠে না, একটা মেয়ে যুবতী হবে না, তাকে বলছি, মা তুমি এসো। তিনি এখন বিষহরিণী। এই পূজা হচ্ছে বাঙালির পুজো। এটা বাঙালির সমন্বয়ের পূজো। হিন্দু-মুসলমান-যোগী সব মিলে একটা সমন্বয় গঠিত হয়েছে। এই মনসার থেকেই পদ্মা। এই পদ্মা-পদ্মিনী নদী বাংলাদেশের প্রাণ। সেই পদ্মিনী, মনসা সব এক।"[১৮]

এই দর্শনটি উপন্যাসে আরও স্পষ্ট হয়, যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় চাঁদ 'হেন্তাল' বলে চিৎকার করে ওঠে। প্রাসাদের ঐশ্বর্যসুখ ও বিলাসের মধ্যেও চাঁদের মনকে এক বিপন্নতা ও অমোঘ আঘাতের ভয় গ্রাস করে থাকে। স্বপ্নে সে পত্রহীন প্রাচীন হিজল গাছের ভয়াবহ অন্ধকারময় কোটরে একটা কুৎসিত দর্শন সাপ পিচ্ছিল গতিতে ফণা লুকিয়ে ঢুকতে দেখে। আসলে এই স্বপ্নদর্শনের মধ্যে রয়েছে আধুনিক মানুষের বিপন্নতার যন্ত্রণা ও একাকিত্বের অসহায়তা। চাঁদের মনসাভীতি এখানে সাপ ও হেতালের মাধ্যমে প্রতীকী হয়ে যায়। মনো-বিশ্লেষণের আধুনিক পদ্ধতিতে এই স্বপ্নদর্শনের বিষয় অর্থবহ হয়ে ওঠে। এখানে চাঁদের গহন মনের অন্ধকারে জমে থাকা সর্পিল মানসিকতা যেন তাকেই গ্রাস করতে আসে। আবার আত্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষা নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, নিজেকে জয়ী করে তোলার প্রচেষ্টা হেতালের রূপকে ভাষারূপ লাভ করে। তাঁর ভয় ও আত্মচিৎকার আসলে মনসার

মতো নিয়ন্ত্রণী শক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করা। উপন্যাসে আবার চিত্রকর তথা শ্রমণ চারুদত্তকেও দেখানো হয়েছে মনসার পূজক রূপে। এই চারুদত্ত ও চন্দ্রশেখরের বাড়ির দাসী সারির মতে, যদি আরো সর্পপূজার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় সমতটে আবার শান্তি ফিরে আসবে। ক্রোধ, বিদ্বেষ, হিংসা কাম, কিছু থাকবে না। এইভাবে সেই শান্ত প্রজ্ঞাশীল সমতট আবার বিজয়ী হবে। ঔপন্যাসিক মনসাপুরাণের বিভিন্ন প্রচলিত এই ধারণাগুলিকে বিশ্লেষণ করেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। চাঁদের জীবনকে কেন্দ্র করে মনসার উপস্থিতি সর্বত্র থাকলেও তা আধুনিক মনস্ক ব্যক্তির কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য মিথটিকে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এইভাবেই ঘটেছে মনসাপুরাণের নবরূপায়ণ।

'চাঁদবেনে' উপন্যাসে চাঁদের সুতীব্র যন্ত্রণা, ভাগ্যের প্রতিস্পর্ধী হবার লড়াই, যুগসন্ধিক্ষণের তন্নিষ্ঠ বাস্তব ইন্দ্রজাল রচিত অধিবাস্তবতা, সময়ের মাত্রাবৃত্তে মানবের অসহায়তা, মৃত্যু থেকে নবজন্মের আভাস, সব নিয়ে এক কৌমসত্ত্বার ট্রাজেডি এই পৌরাণিকতার মাত্রাতে বয়ে এসেছে। বাঙালি জীবনের অতীত ও বর্তমান, স্বপ্নভঙ্গের ঐতিহ্য ও অবক্ষয় কেন্দ্রীয় ভাবনা হয়ে এসেছে উপন্যাসের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত। চাঁদের ব্যক্তিক বিদ্রোহ ব্যক্তিগত থেকেও সামগ্রিক হয়ে উঠেছে। অতীতচারী থেকেও সমকালীন পরিচয় চিহ্নিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সমালোচক সনৎকুমার নস্কর তাঁর 'প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা' গ্রন্থে এই সূত্রে যা মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখ করা প্রয়োজন—

> ''ঔপন্যাসিক চন্দ্রশেখরকে মেলে ধরেছেন বাংলার বহুবিশ্রুত প্রাচীন সমৃদ্ধশালী বাণিজ্যের প্রেক্ষাপটে। এ বাণিজ্য সংঘটিত হত সেইসব নির্ভীক দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী সওদাগরদের দ্বারা, যাদের সামনে ছিল বিশাল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ, জলদস্যুভীতি এবং নানাবিধ প্রশাসনিক বাধা। তবুও এ উপন্যাসের চাঁদ স্বপ্ন দেখেছিল আন্তর্জাতিক অবাধ বাণিজ্যের, চেয়েছিল দেশের সকল বণিকদের সমুদ্রপথ উন্মুক্ত করে দিতে। কিন্তু চাঁদের জীবনে দৈব ও দুর্দৈব একত্র সমাপতিত হয়ে স্বপ্ন পুরো সফল হতে দেয়নি। বলা বাহুল্য যে, আমাদের চেনা কাহিনীর ছক ধরে ঔপন্যাসিক আদৌ এগোননি, কেবল চাঁদ ও সনকার নাম দু'টি অক্ষুণ্ণ রেখে নতুন গল্প ফেঁদে বসেছেন এখানে।''[১৯]

'চাঁদবেনে' মঙ্গলকাব্য নয়, মঙ্গলকাব্য লেখা হয় দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করতে, কিন্তু

উপন্যাসে মানবচরিত্রই প্রধান। মানবচরিত্র নিয়েই উপন্যাসের বিস্তৃতি উক্ত উপন্যাসে রয়েছে দু'জোড়া প্রেমের উল্লেখ— চন্দ্রশেখর-সনকা ও শূরসেন-দময়ন্তি। মনসামঙ্গলের পাতিব্রত্যময়ী, পতিপ্রাণা সতী বেহুলার কোন উল্লেখ নেই উপন্যাসে। মনসামঙ্গলের কাহিনিকে আধুনিক যুক্তিবুদ্ধির বাস্তবতায় দাঁড় করাতে গিয়ে নির্মিত হয় নতুন রচনার। পুরাণের মনসামঙ্গল কাহিনী নবতর দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে।

অষ্টবসুদের একজন ছিল বলেই তার নামের শেষে বসু যোগ করা হয়, চাঁদবেনে বলে এমন জনশ্রুতি আছে। নইলে উপন্যাসের নায়ককে মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগর মনে করার কোন যুক্তি নেই। আসলে লেখকের 'চাঁদবেনে' উপন্যাস ভাগ্যের কাছে পরাজিত মানুষের ট্রাজেডির কথা, বাঙালির কৌম-জীবনের মনন কথা। জয়লাভের সমস্ত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মনসাপুরাণের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বজ্রজয়ী চাঁদকে আত্মসমর্পণ করতে হয় নিয়তির কাছে। এখানে তবুও দেখা যায় মৃত্যু হয়েও মৃত্যু হয়নি চাঁদের। সে উত্তীর্ণ হয় জীবনে সময়-দেশ-কালকে অতিক্রম করে। মৃত্যু হলেও জীবিত থাকবে সন্তানদের মধ্যে। উপন্যাসের শেষে চাঁদকে দেখি সমতট থেকে ফিরে আসার পর সনকার কাছে অনুশোচনা করতে—

> ''আমার, কিছু দিন থেকে ভুল হচ্ছে। অথবা তখনই কি ভুল করেছিলাম? আচ্ছা সনকা, যে ভালোবাসা সন্তানদের প্রাপ্য। পরস্পরকে ভালোবাসতে গিয়ে কি তা থেকে তাদের বঞ্চিত রেখেছিলাম? সে জন্যই কি তাদের তেমন প্রমাণ করতে ইচ্ছা হয়েছিল, তারা আমারই? কিংবা বিরহে ব্যাকুল হবে বলেই কি সমুদ্রে না গিয়ে তাদের যেতে দিয়েছিলাম?''[২০]

তবে মৃত্যুকে জয় করার প্রত্যাশা এই চাঁদবেনের। তাই দু'শো হাত লম্বা, পঞ্চাশ জোড়া দাঁড়, তিনটি নয় থাক পালের মধুলিট জাহাজকে আবার চম্পার সমুদ্রে দেখা যায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। উপন্যাসে চাঁদবেনে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, জটিলতা, চরিত্রের অন্তর্গূঢ় রহস্য ইত্যাদি তুলে ধরতে গিয়ে মনসামঙ্গলের চাঁদ চরিত্রের নবনির্মাণ করেছেন লেখক। বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী মানবিক মূল্যবোধের সংকট তাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। আধুনিক জীবনের প্রেমহীনতা, অতীত ঐতিহ্যের বিচ্যুতি তাকে বিচলিত করে তুলেছিল। অস্তিত্বের সংকটময়ে ডুবে থাকা বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে তিনি তার অভিজ্ঞতার জগৎকে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন এমন এমন এক শিল্পজগৎ-এ, যেখানে সে নিজেই হয়ে উঠতে পারেন একটি ব্যক্তিসত্ত্বাময় মানুষ।

বিষয়বৈচিত্র্যে, স্থান-কালের উল্লেখে, চরিত্র-নির্মাণে, চরিত্রের নামোল্লেখে, ইতিহাসের

বিশ্লেষণে উপন্যাসটি একপ্রকার মহাকাব্যিক রূপ ধারণ করেছে। বাংলা উপন্যাসের পাঁচের দশকের বিভ্রান্তি, সংশয় ও নতুন অনুসন্ধানের পরিস্থিতিতে খুব নিস্তরঙ্গ আবির্ভাব অমিয়ভূষণ মজুমদারের। বুদ্ধিদীপ্ত মননশীল লিপিকুশলতায় উপন্যাসে যুগের ইতিহাসকে তিনি বিবৃত করেছেন। তাঁর অধিকাংশ রচনাই স্বতন্ত্র ও ধ্রুপদী। তিনি প্লটের মিথোলজিক্যাল বা সার্ব্বজনীন উপাদানটিকে অতিক্রম করেছেন। কাহিনীর একমুখীন হুবহু ক্রম তিনি আখ্যানে ব্যবহার করেননি। আখ্যানে তিনি বিভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার নানান ক্রমে বিন্যস্ত করেছেন— যার সঙ্গে অনেক সময়ই কাহিনীর কালের ক্রমের মিল থাকে না। বাস্তবতাকে তুলে ধরতে গেলে কাহিনী ক্রম বজায় রাখলে ততটা জীবন্ত ভাবে ফুটে ওঠে না। ঊনত্রিশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত 'চাঁদবেনে' উপন্যাসে চাঁদ বণিকের চরিত্রকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ঘটনা, সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি দিক স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্যে কালানুক্রমিককে ভেঙে আগের ঘটনা পরে, পরের ঘটনা আগে দেখিয়েছেন অনেকসময়। নির্দিষ্ট কোন প্লট নয়, বৃত্তাকার কাহিনির বুনট নয়, সমতলিক এক কাহিনি পরম্পরা তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটিতে ঘটনার সূত্র ধরে অতীতের ঘটনার 'পূর্বকথন' (Flash back) দেখা যায়। নতুন কাহিনী রচনা করতে গিয়ে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ-এর মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। তিনি আবিষ্কার করতে চান সময় স্বভাবের নতুন তাৎপর্য। এইসূত্রে সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্যের মন্তব্যটি তুলে ধরার চেষ্টা করলাম—

> ''দূরত্ব ও নৈকট্যের দ্বিরালাপে গড়ে ওঠে 'গড়শ্রীখণ্ড' বা 'চাঁদবেনে'র মতো উপন্যাসের সময়। কল্পনা তাঁর কাছে 'অন্তর্ভেদী রঞ্জন রশ্মি, যার সাহায্যে ইতিহাসের নির্মোক অর্থাৎ বহির্বৃত আখ্যান পেরিয়ে তিনি পৌঁছুতে চান অন্তর্বৃত জীবনসত্যের মর্মে।''[২১]

পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার সময় লেখক 'আমি' এই পরিচয়ে কাহিনি বর্ণনা করেছিলেন। গ্রন্থে অধ্যক্ষ পক্ষধর, চাঁদের বন্ধু শূরসেনের কথনে এবং কিছুটা হলেও লেখকের বয়ানে কাহিনী এগিয়ে গেছে। এছাড়া আরবসাগরে গিয়ে চাঁদের কি হয়েছিল তা এব্রাহিম ও দায়ুদ নামে দু'জন আরবী জাহাজী মাল্লা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের কথকতা রীতি, যা মহাভারত থেকে নিয়েছেন। এইভাবে উপন্যাসের প্রকরণের ক্ষেত্রেও তিনি নবনির্মাণ ঘটিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যের উত্তর-আধুনিক কালপর্বে জীবন ও ঐতিহ্যকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত করার যে প্রবণতা, অমিয়ভূষণ মজুমদার তাকেই পূর্ণতা দিয়ে অন্য কাহিনী নির্মাণ করেন। মনসামঙ্গলের নির্দিষ্ট সংকেত নিয়ে নির্মাণ করেন নতুন পাঠকৃতি। তাই উপন্যাসের চরিত্র 'চাঁদ' এর 'মনসা'র বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা একক ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকে না। সে হয়ে ওঠে প্রাচীনকালের তথা দেশ

ও জাতির শ্রীবৃদ্ধির ধারক ও বাহক। ভারতীয় বাণিজ্যের উদ্‌গাতা ও ঐতিহ্যের সংগঠক। উপন্যাসের চাঁদ স্বপ্ন দেখেছিল আন্তর্জাতিক অবাধ-বাণিজ্যের, চেয়েছিল দেশের সফল বণিকদের জন্য সমুদ্রপথ উন্মুক্ত করে দিতে। কিন্তু চাঁদের জীবনে দৈব ও দুর্দৈব একত্র সমাপতিত হয়ে স্বপ্ন সফল হতে দেয়নি। লেখক নিজেই জানিয়েছেন যে, উপন্যাসে সরাসরি মনসার সাথে বিরোধ নেই। যদি বিরোধ থাকে তাহলে সেটা ভাগ্যের সঙ্গে, কালের সঙ্গে। ইতিহাসের তন্বিষ্ঠ গবেষকের মতো তিনি লোকপুরাণের ভিতরকার ইতিহাস উন্মোচিত করে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। সমালোচক রমাপ্রসাদ নাগের ভাষায়—

> '' 'চাঁদবেনে', 'মধু সাধুখাঁ' প্রভৃতি উপন্যাসে মধ্যযুগের কাহিনীতে আধুনিক মাত্রা যোগ করে অমিয়ভূষণ বাস্তবতার মাত্রা সঞ্জাত করেছেন।"[২২]

লেখক সযত্নে মনসামঙ্গল কাব্যের মিথকে ভেঙে এক যুক্তিবাদী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, দোষে-গুণে ভরা চাঁদ চরিত্র নির্মাণ করেন। এই চন্দ্রশেখরকে মনসামঙ্গলে কাব্যের চাঁদবেনে মনে হয় না, সে যেন নবম শতাব্দীর প্রত্ন ভারতবর্ষের এক ট্রাজিক নায়ক। ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত এক অসহায় মানুষের ক্রন্দন আমাদের হৃদয়কে বেদনাসিক্ত করে তোলে। মনসামঙ্গলের পাতায় যে চাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়, অমিয়ভূষণের চাঁদ সেই মানুষটি হয়েও আবার অন্য মানুষ। উপন্যাসে চাঁদের চরিত্রস্বভাব, কর্মকাণ্ড, পরিণাম কিছুই মেলে না। তবুও কাহিনির বয়নগুণে চাঁদের আদল ফুটে ওঠে। তার ভিতরে কোথাও যেন রয়েছে মিথ-পুরাণের সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময় মানুষটির সজীব উপস্থিতি। পদাতিক মানুষ পথ চলতে গিয়ে লড়াই করে। তাঁর জীবনে সফলতা কিংবা বিফলতা ছেয়ে ফেলে। মানুষের ভেতরেই কথা বলে ওঠে কাল ও সময়ের কণ্ঠস্বর। মানবযন্ত্রণা ও কান্নার কলতান বুকে নিয়ে এক বণিক কাহিনি জীবন ও সৃষ্টির নব যোগসূত্র রচনা করেছে। ইতিহাস পুরাণের মিশ্রিত এই উপন্যাসে জীবন ও জীবনের গভীরবোধ আমরা পাই। তাতে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে মনসামঙ্গল কাব্যের নবরূপায়ণ। সেই সঙ্গে কতগুলি অনুষঙ্গ যেমন— চাঁদ বণিকের নাম চন্দ্রশেখর বসু, কম্বুজ-চম্পা-মালয়-উপদ্বীপ-সিংহল-বঙ্গোপসাগর, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি বন্দরের নাম, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, চাঁদপুত্র-সাগরদত্ত, বিজয় ঘোষের ও লখাই-এর বাণিজ্যযাত্রা, নটী লীলালতিকা-নগরনায়িকা ক্ষিরোদসম্ভবা-চিত্রসেন-ভৈরবীর গল্প, শূরসেন-দময়ন্তীর গল্প, চন্দ্রশেখরের তাঁতী সংগ্রহের গল্প, চন্দ্রশেখরের যৌথ বাণিজ্য ও নতুন ধাতু আবিষ্কার উপন্যাসটিকে নতুনত্ব দান করেছে। আলোচনার পরিসমাপ্তিতে সমালোচক প্রভাতকুমার ভট্টাচার্যের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে—

> ''এখানে মনসামঙ্গলের প্রচলিত কাহিনি তথা পুরাণ ও মিথের অনুবর্তন নেই,

রয়েছে মঙ্গলকাব্যের সময়কার বিস্তৃত ইতিহাস। ভারতবর্ষ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ, তথা পূর্ব দ্বীপপুঞ্জ, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন প্রদেশের ভৌগোলিক ক্ষেত্র। সেখানকার জনপদ ও সমাজ ইতিহাসের বৃহৎ প্রেক্ষাপটকে উপন্যাসের কেন্দ্রে স্থাপন করে লেখক সুগভীর ইতিহাস-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন।"[২৩]

পরিশেষে বলা যায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার মনসামঙ্গলের চাঁদ চরিত্রকে মূখ্য হিসেবে গ্রহণ করে তৎকালীন অস্থিরতাময় ও সংকটময় সময়ের মানুষের সত্যের পথে যাত্রাকে তুলে ধরেছেন। এই পথে চলতে গিয়ে অশুভ শক্তির নানা বাধা-বিপত্তি আসলেও থেমে থাকেনি উদ্দেশ্য থেকে। সেই সঙ্গে উঠে এসেছে প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যিক ইতিহাস, যা উপন্যাসটিকে আরো তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। অতীত ঐতিহ্যের ইতিহাসকে তুলে ধরে কল্যাণময় দিকের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এইভাবে মনসামঙ্গলের প্রসঙ্গকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন নতুনভাবে। এইদিক দিয়ে তাঁর 'চাঁদবেনে' উপন্যাসটি মনসা-কথার আধুনিক রূপায়ণ হয়ে উঠেছে।

প্রাচীন সাহিত্য তথা প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যকে বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাংলা উপন্যাসে যে নতুন আখ্যানবিশ্ব তৈরি হয় তা কথাসাহিত্যের জগৎকে করে তোলে সাংকেতিকময়, গভীর ও সর্বসঞ্চারী। স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে যে স্বপ্নরোপণ ও স্বপ্নভঙ্গের কালপর্বটি বাংলা সাহিত্যে বারে বারে গুরুত্ব পেয়েছে। নয়া উপনিবেশবাদের আগ্রাসী মনোভাব যখন আমাদের আদর্শ, বিশ্বাস ও চিন্তার জগৎকে গ্রাস করে তখনই মনের মধ্যে তৈরি হয় নিরাপত্তাহীনতাবোধ অস্তিত্বের সংকটই শুধু নয়, ছিন্নমূল মানসিকতার ঘেরাটোপে আবদ্ধ এই আমরা। এই সার্বিক সংকট থেকে মুক্তিকল্পে কেউ কেউ হয়তো এককভাবেই নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যান। অনেক সময় এই একক সংগ্রামে এগিয়ে চলা মানুষটা ভেতরে ভেতরে নিঃস্ব হয়ে পড়েন, নিজের কাছেই পরাজিত হয়ে আবার নতুন পথের অন্বেষণে যাত্রা। **সত্যপ্রিয় ঘোষ** (১৯২৪-২০০৩) **'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা'** (১৯৯৯) উপন্যাসে এমনই এক মানুষের কথা বলেছেন অন্তরের তাগিদ থেকে।

ঔপন্যাসিক সত্যপ্রিয় ঘোষ প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের নির্মাণ না করে দেশভাগ জনিত কারণে ছিন্নমূল হয়ে পড়া মানুষের বেদনা নিয়ে কঠিনতম সময় অতিক্রম করতে চাওয়া এক মানুষের এগিয়ে চলার কাহিনি অঙ্কন করেছেন। উপন্যাসের শুরু হয়েছে এক হতাশাগ্রস্ত মানুষের নতুন

স্বপ্ন গড়ার মধ্য দিয়ে। এখানে রমানাথ বাবু চাঁদ সদাগরের চরিত্রকে অবলম্বন করে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে চান। তাই তিনি নতুনভাবে থিয়েটার গড়ার কথা ভাবেন। উপন্যাসের শুরুতেই দেখি রমানাথের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি পূর্ণতা লাভ করতে চলেছে স্বপ্নের মাধ্যমে। মশার কামড়, পিঁপড়ের কামড় ও ছারপোকার কামড়ে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় প্রাণপণে চেষ্টা করেন ঘুমানোর। কারণ দেবী মনসার মতো তিনিও পুজো পাচ্ছেন না, কিন্তু পেতে হবে। তাই দেবী মনসার মতো তিনিও ঘুমোতে চান। এই ঘুমের রাজ্যেই আছে কালীদহের তীর, আছে চম্পকনগর, আছে সাঁতালী পাহাড়, আছে ধন্বন্তরী। আশা রাখেন নতুনভাবে স্বপ্ন দেখার মধ্যে তিনি আরো ফিরে পাবেন সেই স্বপ্নলোক, যেখানে আনন্দ আছে, উত্তেজনা আছে, হাসি আছে, বিশ্বাস আছে, আত্মীয়তা আছে এবং সবাই মিলে নবান্নের উৎসব আছে। কিন্তু ঘুম না আসায় নিশুতি রাতের সেই পচা অন্ধকারের মধ্যে রমানাথ কাঁদতে থাকেন। অন্ধ রাগের জেরে বুক ফাটিয়ে তাঁর কাঁদতে ইচ্ছে করে। এই কান্নার জেরে গোটা জগৎসংসারের চোখে জল আসুক, এই দয়াহীন, মায়াহীন মানুষগুলি শুধু নিজেকে নিয়ে থাকা বাদ দিয়ে জীবনভর স্বপ্নের ফেরিওয়ালা এই হতভাগা মানুষটা কী বলতে চায় তা সবাই একটু খেয়াল করুক।

উপন্যাসে দেশভাগ, তজ্জনিত অস্থিরতা, উদ্বাস্তু হয়ে বরিশাল থেকে কলকাতায় এসে ছিন্নমূল মানসিকতা তৈরীর যন্ত্রণা, নতুন করে বেঁচে ওঠার আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। একই সঙ্গে সন-তারিখ ধরে গত শতকের চারের দশকটি কাহিনীতে বিস্তৃত হয়েছে। সেই সময়ে বাস্তব সমস্যা ও সংকটের ঘূর্ণিপাকে আবর্তিত হয়েছে রমানাথ। দশটি অধ্যায়যুক্ত এই উপন্যাসে রমানাথের জীবনের সঙ্গে উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র সাধনাদের পরিবারের চিত্রও উঠে এসেছে। ছয় ভাই ও এক বোন নিয়ে বনেদী বংশের সন্তান রমানাথ কলেজে পড়তে এসে সাধনাদের পরিবারের একজন হয়ে ওঠেন। সাধনার পিতা অ্যাকসিডেন্টে মারা যায় এবং প্রায় ডুবে যাওয়া সংসারের হাল ধরেছেন। পরে আবার দেশভাগের সময় এপার বাংলা আসার মুহূর্তে রমানাথই সাধনাদের পরিবারের অভিভাবক হয়েছিলেন। সাধনার পরিবারে পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে বড় ছেলে নরেন্দ্রখোকা নিরুদ্দেশ হয়, মেজো বোন বিন্দা সাতদিনের জ্বরে মারা যায়। বর্তমানে বোন অর্চনা, ভাই বরেন, স্বামী কেশব ও অজিত-সুজিত দুই ছেলে নিয়ে সাধনার ভরা সংসার। দেশভাগ জনিত কারণে একটি পরিবার কীভাবে অন্য এক দেশে উদ্বাস্তু হয়ে স্টেশনে জীবনযাপন করে এবং করে সকলে মিলে দেড়খানা ঘরে বসবাসের যে বিচিত্র জীবন তা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উঠে এসেছে উপন্যাসে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রমানাথকে মুখোমুখি হতে হয় ছেচল্লিশের দাঙ্গার। দেশ ভাগ হওয়ার সময় পঞ্চাশের দশকে বরিশালের ঘর-বাড়ি সর্বস্ব ছেড়ে আত্মীয়-স্বজন নিয়ে কলকাতায় আসেন। শিয়ালদহের স্টেশনের প্লাটফর্মে দেড় মাস কাটিয়ে মেছোবাজারের পাঁচতলা বাড়ির দেড়খানা ঘরে আশ্রয় নেয়। দাঙ্গা-দেশভাগের ক্লেদাক্ত অন্ধকারের বিষক্রিয়ায় ছিঁড়ে যাওয়া স্বপ্ন বপন করে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে তা সঞ্চারিত করতে বদ্ধপরিকর। তিনি সমস্ত মানুষকে আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে লোকায়ত শেকড়ের সন্ধানে যাত্রা করেছেন, নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদে। আর এই পথ অতিক্রম করতে করতে নিজেকে চাঁদ সদাগর বলে মনে করেন—

> ''আমার আয়ুরেখাটি চাঁদ সদাগরের মতোই দীর্ঘ। সপ্তডিঙা মধুকর ঝড়বৃষ্টি
> তুফানে মনসা ডুবিয়ে দিল দিক না, আবার সব হবে, বেহুলা কি সত্য নয়?
> আমি যদি হই চাঁদ সদাগর, আমার জীবনে বেহুলা কি আসবে না?''[২৪]

নিজের সংসার নেই, তাই চাঁদের পুত্রবধূর মতো বেহুলা তাঁর জীবনে আসবে না বলে হতাশায় জর্জরিত হয়। শুধুমাত্র সাধনাদের পরিবারে মাঝিগিরি করেননি। আরো অনেক পরিবারকে নিজের সঙ্গে একাত্ম করেছেন। বর্তমান জীবনে ভাঁটার টান থাকলেও জোয়ার আসবে। এই জীবনের নদী পার হতে গেলে একা চললে হবে না, স্বার্থপরতা তাঁর দু'চোখের বিষ। তাই সবাই মিলে কোমর বেঁধে উজানের দিকে যেতে হবে। সাধনাদের ঘাটে বিস্মৃতির ঝড় উঠলে সেখান থেকে নোঙর তুলে অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবেন। শেষে ঘুম না আসায় নিজের দেখা স্বপ্নসুখ থেকে বঞ্চিত হলে বদ্ধ উন্মাদের মতো দুহাতের দশটা আঙুল দিয়ে দশটা ধারাল নীল নখ দিয়ে নিজের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলেন । তখন যেন তিনি মনসার কোপে কালীদহের কালো জলে বজ্রপাত ও তুফানে বিধ্বস্ত সপ্তডিঙা মধুকরের সলিল সমাধির পর জলমগ্ন মুমূর্ষু চাঁদ সদাগর। কিন্তু আটচল্লিশ বছরের পৌঢ়, অকালে বুড়িয়ে যাওয়া অসহায় রমানাথ মনের মধ্যে আবার ফিরে পেলেন স্বর্গ। স্বপ্নের সেই প্রবাল দ্বীপ যেখানে তাঁর জন্য একটি সাতমহলা বাড়ি তৈরি হচ্ছে, যেখানে তিনি এক আশ্চর্য সুন্দর সংসার সাজাবেন সমস্ত আত্মীয়কে একান্নবর্তী করে নবান্ন উৎসব করবেন।

পরপর তিনবার বি.এস.সি ফেল করার কারণ হিসাবে তাঁর নাটক ও থিয়েটারের প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণকে ধরেছেন উপন্যাসের নায়ক রমানাথবাবু। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় হঠাৎ করে বাংলার রাজধানী কলকাতায় বেড়াতে আসেন। সেখানে নিজ গ্রামের হারান ঠাকুর (প্রবোধচন্দ্র গুহ) আর্ট থিয়েটারের সেক্রেটারি, তাঁর কাছ থেকে ফ্রি-পাশ

নিয়ে মনোমোহন নাট্যমন্দিরে মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগর' নাটক দেখেন। চৌদ্দই সেপ্টেম্বর 'চাঁদ সদাগর'-এর প্রথম রজনীর অভিনয় দেখে চাঁদ সদাগরের তেজ, সর্বস্ব হারিয়ে তা ফিরে পাওয়ার লোভেও মনসারূপী অপদেবতাকে পূজা করবেন না প্রতিজ্ঞা করে তিনি পূজা দিয়েছেন শিবের, তাঁরই আগুনে পুড়েছেন। রমানাথও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পূজা দিয়ে চলেছেন। এমন থিয়েটারকে পূজা দিবেন যেখানে আদর্শ আছে, তেজ, আছে এবং তা দিতে হবে নতুন প্রজন্মকে। এই সূত্রে রমানাথবাবু তাঁর থিয়েটার জগতে পদার্পণের ইতিহাসকে তুলে ধরেন। ১৯৩০ সালে তিনি থিয়েটার জগতের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। কিন্তু এর বীজ পোতা হয়েছে তার তিন বছর আগে। ১৯২৪ সালে সাইমন কমিশনের আগমনের প্রতিবাদে ফ্রেব্রুয়ারি মাসে সারা বাংলায় যখন আন্দোলনের জোয়ার চলছিল, বরিশালের পথে পথে রমানাথ গান গেয়ে মিছিলে যোগ দিয়েছেন। ১৯২৯ সালে বানারি পাড়া গ্রামের থিয়েটারে কালীপুজোর অভিনয়ের দায়িত্ব নেন। পটুয়াখালি শহরের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার প্রভাব এই বানারি পাড়াতেও পড়েছিল। তরুণ রমানাথ অভিনয়ের দায়িত্ব পালনে জীবন পণ করেছিলেন। বড়োদের নাটক প্রতাপাদিত্য, সেই সঙ্গে সেই ঘোষের বাড়ির স্টেজেই শুধু ছোটদের দিয়ে নাটক 'চাঁদ সদাগর'। পরের বছর এই 'চাঁদ সদাগর' বরিশালে নামানোর জন্য উঠে পড়ে লাগেন রমানাথ। সেই সঙ্গে তাঁর বি.এস.সি. পরীক্ষাও কালীদহের অতলে বার বার তিনবার তলিয়ে যায়।

নাটকের ভবিষ্যৎ ছোটদের হাতেই, একথা বিশ্বাস করেন রমানাথের পথ প্রদর্শক প্রবোধচন্দ্র গুহ। যিনি বানারিপাড়াতে 'লিলি থিয়েটার' নামে কিশোর নাট্যদলের প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বরিশাল জেলার এই বানারিপাড়ার গ্রামকে এক পীঠস্থানে পরিণত করেছিল। সেখানে এই কিশোর নাট্যদলের ভূমিকা ছিল অনিবার্য। নাটকের পর নাটকের মধ্য দিয়ে সংগ্রামের বীজগুলি কিশোরদের মনের গভীরে রোপিত হয়েছিল। আর রমানাথ এই কাজ নিজের জীবনে তুলে নিয়েছেন, ব্রতী হয়েছেন যেন। কিন্তু এখনকার ব্যস্ততাময় যুগে কারো হাতে সেরকম সময় নেই। তাই তিনি ভোরবেলায় দেখা স্বপ্নটিকে অবলম্বন করতে চান। সমস্যা অনেক, কাজ অনেক কিন্তু পথ মাত্র একটাই। বিধাতা স্বয়ং তাকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন, তিনি যেন স্থির বিশ্বাস নিয়ে আবার একটি অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন কাচ্চা-বাচ্চাদের নিয়ে। রমানাথের মতে—

> ''এই ভঙ্গ বঙ্গে, এই দেশজোড়া ধ্বংসের মধ্যে, বেঁচে উঠার উপায় যদি বার করতেই হয় তাহলে এই বাচ্চারাই ভরসা, নিউ জেনারেশন কী যেন বলে সাধু বাংলায়? নতুন প্রজন্ম, ঠিক, এদের দিয়েই গড়ে তোলা সম্ভব স্বপ্নের

প্রবাল দ্বীপ। একটা নাম চাই। তাঁর পছন্দ 'শিশু নাট্যনিকেতন', কিন্তু দাদা বলেছেন দে 'শিশুরঙ্গ'।"[২৫]

আটচল্লিশ বছরের প্রৌঢ় রমানাথ ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক উত্তাল— যেমন সাইমন কমিশনের প্রতিবাদে আন্দোলনের জোয়ার, বরিশাল জেলার বানরিপাড়ার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, পটুয়াখালি শহরের দাঙ্গা প্রভৃতি বাস্তব ঘটনার মুখোমুখি হন যা তাকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। এই স্বদেশ প্রেমের আবেগই তাঁর থিয়েটার জগৎ ও নাটকের মূলমন্ত্র। দেশের টানই তার থিয়েটারের আদর্শ ও তেজ বানিয়ে ফেলেন। তাই তিনি 'চাঁদ সদাগর' নাটককে অবলম্বন করেন দেশের খুদে শিল্পীদের স্বদেশের কাজে নিয়োগ করতে। এই নাটকে চাঁদ সদাগরের বলিষ্ঠতা, দৃঢ়তা, একনিষ্ঠতা, সত্যের প্রতি অটল বিশ্বাস রমানাথকে কিশোর বয়স থেকেই মোহিত করে, যা তিনি নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিস্তারিত করতে চান। তাই তাঁর স্বপ্নাদেশটিতে আবার চাঁদ সদাগর নিয়েই নামতে বলা হয়েছে। তাতে কোন অস্পষ্টতা নেই। 'চাঁদ সদাগর'-এর পর 'বিসর্জন' তার পরে 'সীতার বনবাস', তার পরে 'কর্ণ'— এরকম আভাস আছে স্বপ্নে। তিনি অজ্ঞাত কুলশীল গুটিকতক ছেলেমেয়ে নিয়ে এমন নাটক জমাতে চান রাজধানীর রঙ্গমঞ্চে, যা দেখে সারাদেশ অভিভূত হয়ে থাকবে বাণিজ্যিক থেকে তিনি 'শিশুরঙ্গ' গঠন করতে চান না, তবে এর থেকে যদি একটা আর্থিক বুনিয়াদ তৈরি হয়েও যায়, তাহলে সেটা বিপুলায়তন পরিকল্পনা করে সকলের জন্য সেটা কাজে লাগাবেন, শুধু একার জন্য নয়। তাই রমানাথ স্বপ্ন দেখে গড়ের মাঠে টি আর কলকাতায় মার্বেল প্যালেস করতে। তাই যৌবনের 'চাঁদ সদাগর' পরিচালনার বিন্দার মতো মনসা ও অশ্রুর মতো বেহুলা না পাওয়া গেলেও হাল ছাড়েননি। নতুনভাবে সে খুঁজে নিতে চায় যোগ্য মনসা, বেহুলা, চাঁদ সদাগর ও অন্যান্য চরিত্রগুলি।

তৎকালীন সময়ে বাংলা নাটকের যে দিকবদল দেখা গিয়েছিল তা উপন্যাসে উঠে এসেছে। তেতাল্লিশের মে মাসে কলকাতায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা হলে 'নবান্ন'র (চুয়াল্লিশ সালের অক্টোবর মাস থেকে) মতো নাটক কলকাতা থেকে শুরু করে বাংলায় বিভিন্ন প্রান্তে হাজার হাজার মানুষকে গণশক্তির উদ্বোধনের মন্ত্রে মাতিয়ে তুলল। বাংলা নাটকের এই নবযুগের সূচনায় অবসানের ঘন্টা বেজেছিল তার পূর্ববর্তী প্রায় সাত দশকব্যাপী গতানুগতিক পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকগুলির, যা রমানাথবাবুর কাছে একেবারে পছন্দের বিষয় ছিল না। পশ্চিমা নাটকের ভাব অবলম্বনে যে আধুনিক নাটকের সৃষ্টি। সেখানে নায়ক-নায়িকার অভিনয় ছাড়িয়ে দলগত অভিনয় প্রাধান্য পায়। চরিত্র ও সংলাপের কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। কতকগুলি লোক স্টেজে আসছে।

কথা বলছে। চেঁচামেচি করছে, স্ট্যাচু হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ফ্রিজ হয়ে যাওয়া যাকে বলে। আবার মুখ খুললে কি সব কথা বলে যায়, যার অর্থ বোঝা যায় না। অভিনেতা অভিনেত্রীরাও জানে না তাদের অভিনয়ের অর্থ কি। সবই যেন হিং টিং ছট। রমানাথের মতে, স্টেজের জাত মারা যাচ্ছে। অথচ এই স্টেজের উপর দাঁড়িয়ে কি না করা যায়। অদ্ভুত এই বর্তমানের সময় ও সমাজ। বর্তমান দুনিয়াটা অচল হয়ে যাচ্ছে, রক্তচলাচল যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের শেষ দৃশ্য, হাহাকারের শেষে সবাই মিলে আবার নবান্ন উৎসব করছে। তাঁর কাছে এটি বেষ্ট সিন। শেষের যে ছড়াটি বা মন্ত্রটি তাঁর নাটকে ঢুকিয়ে দিবেন বলে স্থির করেন। তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটক তাঁর কাছে প্রশংসনীয়। রহিমুদ্দী ও ফুলজান চরিত্রের অভিনয় তাকে মোহিত করে। গোবিন্দ ও হাকিমুদ্দী চরিত্রও। নাটকের গানগুলিও যেন হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। দুর্ভিক্ষতাড়িতদের জন্য লঙ্গরখানা চালানোর প্রয়োজনে রমানাথের মতো লোকেরা নাটক চালিয়ে পিপলস্ রিলিফ কমিটির তহবিলে অর্থদান করে। তবে বরেনের মতো প্রগতিশীল বস্তুবাদী বিচারবুদ্ধি মানুষ নতুনত্বের দিশারী, রমানাথের দেশের শিকড় ধরাতে বিশ্বাসী নয়। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাংলা নাটকের গতিপথের পরিবর্তনটি চিহ্নিত করেছেন লেখক—

> ''প্রায় সাত দশকব্যাপী গতানুগতিক যে সব পৌরাণিক, ঐতিহাসিক আর সামাজিক নাটকগুলির আবেগসর্বস্ব অলীক স্বপ্নচারিতা, তার মধ্যে বরেন রমাদার ঐ চাঁদসদাগরকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপযোগ্য বলে বিবেচনা করেছিল।''[২৬]

বনেদী পরিবারের সন্তান রমানাথ ছিল রসায়নের ছাত্র। গুরু ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। অবশ্য তাকে দেখেননি কোনদিনও। বই পড়েই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। এ.পি.সি. রায়ের 'বাঙ্গালীর মস্তিস্ক ও তার অপব্যবহার' বইটি পড়ে তিনি মস্তিষ্কের ব্যবহার শিখলেন। 'অন্নসমস্যায় বাঙ্গালির পরাজয় ও তাহার প্রতিকার' পড়ার পর প্রথমেই তৈরী করলেন সাবান, কাপড় কাচা সাবান, তারপর একে একে দাঁতের মাজন, আলতা, মাথার তেল, ধূপকাঠি, স্নো, পাউডার, কুমকুম, লিপস্টিক, নেল পালিশ, জুতোর পালিশ ইত্যাদি তৈরির কাজে লাগেন। তারপর জে-বি-ডি কালি গোটা বঙ্গদেশ এবং তার বাইরের বিখ্যাত সেই কালি তৈরীর কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেন। এইভাবে আমরা দেখি রমানাথ দেশের স্বদেশীকতাকে গ্রহণ করার আন্দোলনে মেতে উঠেছেন।

সপ্তম অধ্যায়ে আমরা দেখি রমানাথের সঙ্গে তাঁর শিষ্য অর্থাৎ সাধনার স্বামী কেশব চাঁদ সদাগর নাটকের অভিনয় নিয়ে যথেষ্ট তৎপর। সে নিজে রমানাথকে উৎসাহিত করে 'চাঁদ সদাগর'কে

কেন্দ্র করে দেশের স্বপ্ন পূরণ করতে। কেশবের দুই ছেলে অজিত ও সুজিতও নাটকে অভিনয়ের ব্যাপারে খুবই উৎসাহিত। কিন্তু নাটক নিয়ে রমানাথকে মনমরা অবস্থায় দেখলে কেশব তার স্ত্রী সাধনাকে এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন। রমানাথের লিখিত 'চাঁদ সদাগর'-এর খাতা হারিয়ে গেলে কেশব সাধনাকেই দায়ী করেন। কেশব এই সময় সাধনাকে চেঙমুড়ি কানী বলে মনে করেন। কারণ রমানাথের থিয়েটারের পথে সাধনা যেন বাধাস্বরূপ। লেখকের ভাষায় সুন্দরভাবে উঠে এসেছে—

> ''ঐ সব করতে করতে কেশব তার বউকে মনে মনে চেঙমুড়ি কানী বলে গাল পেড়েছে, কেননা চাঁদ সদাগরের সপ্তডিঙা মধুকর যেমন মনসা কালীদহে তুফান তুলে ধ্বংস করেছে তেমনি কেশবের ধারণা রমাদাকে তলিয়ে দেবার জন্যও দায়ী এই রমণী, সুতরাং সেও চেঙমুড়ি কানী ছাড়া আর কি।''[২৭]

রমানাথের থিয়েটারকেন্দ্রিক জীবনকে কেন্দ্র করে আবার উঠে আসে সাধনার নিজস্ব কথনে তার জীবন কথা। একসময় যে রমানাথ তাদের পরিবারের হাল ধরেছিলেন। এই মানুষটিকে সাধনা চেয়েছিল জীবনসঙ্গী করতে। কিন্তু থিয়েটার নিয়ে মাতুয়ারা এই উদ্ভট ব্যক্তিটির কোন সিদ্ধান্ত ছিল না। সাধনার অনেক সময় মনে হত রমাদা তার বোন বিন্দাকেই পছন্দ করে না তো। শেষে রমানাথের শিষ্য কেশবের সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলতে শুরু করল তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য। এই কেশবই একসময় ক্যাবলার মতো ঘাঁড় গুজে তাকে বিয়ে করে। প্রায় তেরটি বছর হয়ে গেল তাদের বিবাহিত জীবনের। এখনও রমানাথকে আদর্শ হিসেবে দেখেন। তাই রমানাথ তাদের সংসারে থাকলেও তাকে নিয়ে কেশবের কোন বিকার নেই। কিন্তু সাধনার প্রায়ই মনে হয় রমাদা তাদের মধ্যে একটা দুর্গ্রহের মতো। এখানে থাকলে রমানাথ কোনদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবেন না। তাঁর মেজদার জন্য যেখানে বাড়ি ভাড়া নিবেন সেখানে গিয়ে থাকুক না করুক জয়েন্ট ফ্যামিলি ও নবান্ন উৎসব। নিজের ছেলেদুটোকে মানুষ করার জন্যও চিন্তিত সাধনা। কেশবও তাঁর ভক্ত। রমাদাকে না সরাতে পারলে কেশবকে দিয়ে বেশি টাকা উপার্জন করানো যাবে না। তাছাড়া সবসময় মুখের কাছে থাকে লোকটা— সাধনাও তো মানুষ। যদি কিছু হয়ে যায়।

কিন্তু রিহার্সালের আসর রমানাথ সাধনার ঘরেই বসায়। রমানাথ তার শিশুরঙ্গকে 'কম্বিনেশন অফ অল' বলে উল্লেখ করেছেন 'আর্ট প্লাস, ফিলজফি প্লাস, ইন্ডাস্ট্রি অ্যাণ্ড বিজনেস। আর সবকিছুর ম্যানেজমেন্ট থাকবে বাচ্চাদেরই হাতে। ফ্রম জুতা সেলাই টু চণ্ডীপাঠ। প্রথম পর্যায়ের দিকে বড়োরা

উপদেশ দিলেও বেশিদিন তারা থাকতে পারবে না। কারণ তিনি এই শিশুরঙ্গকে একেবারে শুদ্ধ করতে চান। কোনোরকম ভেজাল তার মধ্যে থাকবে না। একেবারে পিওর পলিটিক্স আদর্শ স্টেটের 'ফর দি পিপল, অব দি পিপল, বাই দি পিপল'-এর মতো 'ফর দি চিলড্রেন, অব দি চিলড্রেন, বাই দি চিলড্রেন'।

রমানাথ নিজেকে মন্থনরজ্জু বাসুকি মনে করেন। সবাই মিলে তাকে পাক দিয়ে যাচ্ছে; যৌবন থেকে বাসুকির মতো তারও সহ্যশক্তি কমে গেছে যেন। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোকে যেন তাঁর ফাঁদে নিরুপায় মহাদেব। চাঁদ সদাগরের মতো নিজেকে অসহায় ব্যক্তি মনে করেন। রিহার্সালের সময় হঠাৎ চাঁদ সদাগরের সংলাপ বলতে থাকেন অপ্রাসঙ্গিকভাবে—

> ''এ আমাদের পরাজয় নয়। এ আমাদের পরাজয় নয়। ওরা কাপুরুষ। ওরা উপর্যুপরি বিপদ্‌পাতে দুর্বল। তুমি তো ভীরুর দেবতা নও, কাপুরুষের—''[২৭]

আস্তে আস্তে শিশুরঙ্গের এই স্বপ্নের ফেরিওয়ালা রমানাথ ঘোষ অনেক মাত্রায় বেসামাল হতে লাগলেন। হঠাৎ করে কেশবের অসুস্থতা, বাচ্চাদের পরীক্ষা ইত্যাদি নানা কারণে তাঁর শিশুরঙ্গের ভীত আলগা হতে লাগল। তবুও দেখা যায় স্বপ্নের ফেরিওয়ালা রূপে সমস্ত আঘাত ও অপমান সহ্য করে তিনি নিজের তৈরি পথে চলতে থাকেন। সেখানে একান্নবর্তী পরিবারের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পান। সমস্ত মানুষকে নিয়ে নবান্নের উৎসবে মেতে ওঠার স্বপ্ন গভীতর হয়ে ওঠে। মঞ্চে 'চাঁদ সদাগর' নাটক মঞ্চস্থ করে তাই বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, ঔপনিবেশিক অপদেবতা চেঙমুড়ি কানীদের মুনাফার লোভের কাছে মানুষ হার মানবে কেন? কেনই বা তারা শুধু পূজা দিয়ে নিঃস্ব হবে, বা রাজ্যহারা, পুত্রহারা ও স্বপ্নহারা হবে। সপ্তডিঙা ডুবিয়ে দিয়েছেন যে মনসা, এ যুগের চাঁদ রমানাথ সেই প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির বিরুদ্ধেই একক সংগ্রাম করে সব ফিরিয়ে আনতে চান। এই ফিরিয়ে আনার স্বপ্নে বিভোর রমানাথ যখন লক্ষ্যপথে যাত্রা করেন তখন এই কাহিনী আক্ষরিক অর্থেই হয়ে ওঠে বিশ শতকের মানুষের সংগ্রামের প্রজ্জ্বলিত শলাকা।

সত্যপ্রিয় ঘোষ মনসামঙ্গল কাব্যের পুরোপুরি নির্মাণ করেননি। এখানে দেশভাগ জনিত কারণে ছিন্নমূল হয়ে পড়া মানুষের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে কঠিনতম সময় অতিক্রম করতে চাওয়া এক মানুষের এগিয়ে চলার কাহিনী। তবে মনসামঙ্গল কাব্যের প্রচলিত মিথকে নতুন করে আনার প্রচেষ্টা দেখা যায়। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রমানাথ নিজেকে অনেক সময় চাঁদ সদাগর ভাবেন। তাই মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগর' নাটক দেখে চাঁদ চরিত্রকে নিজের জীবনের আদর্শ বলে মনে করেন—

যা উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত আমরা প্রত্যক্ষ করি। তাঁকে দেখা যায় বেহুলার সন্ধানে প্রয়াসী, যে তাঁর জীবনে সমস্ত আনন্দ ফিরিয়ে দেবে। অনায়াসেই পাড়ি দেবে কালীদহের মধ্যে অর্থাৎ সমস্যাদীর্ণ মানুষের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে। এই বেহুলা এমন এক দেশের সন্ধান করবে যেখানে ঘুম নেই, জরা নেই, মৃত্যু নেই। সেই অমৃতের দেশ খোঁজ করবে। একবার তিনি 'চাঁদ সদাগর' নাটকের নাম বদলে রাখেন বেহুলা। আবার কেশবের মতে, মনসামঙ্গলের মনসা যেমন চাঁদ সদাগরের জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি সাধানাও যেন রমানাথের লক্ষ্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনসামঙ্গলের মিথ অতি সূক্ষ্মভাবে উঠে এসেছে উপন্যাসে। তৎকালীন সময়ের বিচিত্র, দুর্বোধ্য ও অর্থহীন গতিতে ক্লান্ত রমানাথ চাঁদ সদাগরের পৌরুষের মধ্যে খুঁজে পান অপ্রতিরোধ্য শক্তি। তাই শিশুরঙ্গ নাট্যগোষ্ঠী তৈরি করে চাঁদ সদাগরের গল্পকে আবার নিজের মধ্যে আত্তীকরণ করতে চান। আসলে বিশ শতকের মানুষের সংকট ও তাকে অতিক্রম করতে চাওয়ার মধ্যে যে নিরন্তর সংগ্রাম, লেখক তাকেই বাস্তবায়িত করেছেন। সুদীর্ঘ এই উপন্যাসের বিস্তৃত অংশে সেকালের চাঁদের নবমূল্যায়ন ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক জহর সেনমজুমদার তাঁর 'সত্যপ্রিয় ঘোষ স্বপ্ন ও শিকড়ের সন্ধান' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন—

> ''সেকালের চাঁদকে আত্তীকরণ করে, সেকালের চাঁদকে deconstruct করে, রমানাথ চেয়েছেন সত্যভ্রম থেকে নিজেকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকেও মুক্ত করতে। অপাবৃত জীবনসন্ধানী রমানাথ তাই দাঙ্গার মধ্যে শেষ হয় না, দেশভাগের মধ্যে শেষ হয় না, মনসার সৃষ্টি করা চোরাবালিতে তলিয়ে যায় না।''[২৯]

রমানাথ দাঙ্গা-দেশভাগের ক্লেদাক্ত অন্ধকারের বিষক্রিয়ায় ছিঁড়ে যাওয়া স্বপ্ন বপন করে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে তা সঞ্চারিত করতে বদ্ধপরিকর। তিনি সমস্ত মানুষকে আত্মীয়তার বন্ধনে বেঁধে লোকায়ত শেকড়ের সন্ধানে যাত্রা করেছেন। এই স্বপ্ন ফেরি করতে যাওয়ার শক্তি তিনি মনসাপুরাণের কাছ থেকেই পেয়ে যান। তাই তিনি আবার সব হবে এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন। তাঁর এই 'আবার সব হবে' এই আশাবাদ সমগ্র উপন্যাসের আপ্তবাক্য হয়ে ওঠে। কলেজ ছাত্র রমানাথ সাধনাদের পরিবারের একজন হয়ে উঠলেও নিজেকে সেখানে হারিয়ে দেননি। ইচ্ছে করলে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো স্থূল জীবনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে সাধনাকে বিবাহ করে তার প্রত্যাশার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারতেন। পরিবর্তে তিনি নিজের ব্যক্তিগত সুখের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। নিতান্ত সাধারণ চাকরি জীবনের কাম্য নিশ্চয়তা থেকে সরে নাটকের মতো সৃজনশীল

জগতের দিকে যাত্রা করে নতুনতর বোধে উপনীত হতে চেয়েছেন। এই নতুনতর বোধের জগতে পৌঁছানোর জন্য রমানাথ মনসামঙ্গলের আইডিয়ার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়েছেন। এবং চেতনার উত্তরণ ঘটিয়ে নতুন বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সপ্তডিঙা মধুকর তলিয়ে গেলেও আবার তা উঠে আসবে, মনসার প্রকোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করে চাঁদ হয়ে উঠবে অপরাজেয়। রমানাথের জীবনদর্শন তাই স্বাভাবিক ভাবেই সাধনাদের নাগালের বাইরে থেকে যায়। মূলত নাটক এবং নাট্যবিষয়কে দৃঢ়তার মধ্যে ধরেই পূর্ণ হয়েছে রমানাথের মনোভূমি। চাঁদসদাগর নাটকের স্বপ্নই তাকে অতীত ও বর্তমানের সীমারেখার মধ্যে দাঁড় করায়। এই স্বপ্নের আত্মীয়করণের মধ্যে দিয়ে তিনি নিজেই 'চাঁদ' হয়ে ওঠেন। উপন্যাসে একের পর এক পক্ষ বিস্তার করতে থাকে কালীদহের তীর, চম্পকনগর, সাঁতালী পাহাড়, ধন্বন্তরি ওঝা, বেহুলা ও মনসার অভিব্যক্তি।

'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' রমানাথ বাবু একসময় নিতাইচরণের বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গোক্তিকে উপেক্ষা করে তৈরি করতে চান ইতিহাস। তাই রবীন্দ্রনাথের যেমন বিশ্বভারতী, পি সি রায়ের যেমন বেঙ্গল কেমিক্যাল, শ্রীঅরবিন্দের যেমন পণ্ডিচেরী আশ্রম, তাঁরও তেমনি শিশুরঙ্গ। কিন্তু তার এই স্বপ্ন একসময় ভেঙে যায়। উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে দেখা যায় চাঁদ সদাগরের ভূমিকাপ্রাপ্ত ছেলেটি অনুপস্থিত থাকায় রমানাথ তাঁর ভূমিকায় সংলাপ বলতে গিয়ে নিজেই ভুলে যান। আসলে কিছু লোক রমানাথকে দোষারোপ করে কূটনৈতিক লোক ঠক, প্রবঞ্চক বলে। শিশুরঙ্গের পরিকল্পনা নাকি একটা ব্যবসাদারী, বাচ্চাদের নাচিয়ে তাদেরই নামে দু-পয়সা কমিয়ে নিতে চায়। অন্য সব ব্যবসায় বারে বারে ফেল মেরে, লোকসান দিয়ে হালে পানি না পেয়ে শেষে নাটক নিয়ে পড়েছে বলে অনেকের মন্তব্য। তাঁর পেছনে জমা হয়েছে অনেক লোক, এমনকি সাধনাও। হৃতসর্বস্ব উন্মত্ত চাঁদ সদাগরের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়ান নিঃস্ব মনে। রাস্তা ভুল করে কোনরকমে উঠে আসেন সেই মেছোবাজারের পাঁচতলা বাড়িতে। নিরূপায় রমানাথ নিঃসঙ্গ শূন্যে নিরস্ত্র দুই হাতে যুদ্ধ করতে লাগলেন শুধু ধারালো নখগুলো দিয়ে। নিজেকেই ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলেন। শত্রুকে হত্যা নয়, সবচেয়ে সোজা আত্মহত্যা। ভয়ঙ্কর এই লড়াই চালাতে চালাতে অবচেতন তন্দ্রার ঘোলা জলের মধ্যে পড়ল এই মানুষটি। অগভীর সেই জল থেকে চৈতন্যহীন ঘুমের গভীরতায় তলিয়ে যাবার জন্য এই মানুষটি আমানুষিক পরিশ্রম করতে লাগলেন। ঘুমের নদীর উপকূল ধরে মরিয়া হয়ে ছুটতে ছুটতে এই স্বপ্নশীল মানুষটা ক্রমে কালীদহের তীরে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। দূর থেকে জয়ধ্বনি শোনা যায়— 'হর হর মহাদেও ! হর হর মহাদেও !' অবচেতনে যেন চাঁদ সদাগর ও মনসাকে দেখতে পায় রমানাথ। ঔপন্যাসিকের ভাষায় দৃশ্যটি সুন্দররভাবে ফুটে উঠেছে।

> ''ও ছদ্মবেশিনী। ও আসলে মনসা। এক্ষনি সে হরণ করবে চাঁদ সদাগরের মহাজ্ঞান মনি, চাঁদের রক্ষাকবচ। কপট মিথ্যাচারে সরল সাদাসিধা মানুষ চাঁদের করুণা ভিক্ষা করবে, কিছুই না বুঝে চাঁদ বোকার মতো দিয়ে দেবে তার মণি। এই ছলনার জালেই চাঁদ সর্বস্বান্ত হবে, হবে পুত্রহারা, হবে রাজ্যহারা, তলিয়ে যাবে তার সপ্তডিঙা মধুকর।''[৩০]

এতবড়ো মিথ্যাচার রমানাথ আর সহ্য করবেন না। মোহের জাল ও ছলনায় জাল ছিঁড়ে ফেলবেন তিনি। উক্ত দৃশ্যের পরে এই কাহিনী আর শুধুমাত্র আধুনিক বিপন্ন মানুষ রমানাথের থাকেননি, তা হয়ে উঠেছে নতুন এক সংগ্রামের ভাষা। রমানাথ জগৎ সংসারের এই ক্রুর নিয়তির খেলা থেকে চাঁদকে বাঁচাবেন, রক্ষা করবেন স্বপ্নের কাজল-মাখানো রূপকথার ঐ সপ্তডিঙা মধুকর। কিন্তু সে রক্ষা করতে পারে না, বর্তমান যুগের ছলনায় আক্রান্ত সাধারণ মানুষকে। ছদ্মবেশধারী মনসার ছলনায় সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার যে অদম্য উচ্ছ্বাস তা অস্তমিত হয়ে যায়। অন্ধকার ছেয়ে ফেলে চারপাশ, কোথাও কোন আলোর দিশা নেই। কিন্তু মনসামঙ্গলের চাঁদের মতো অন্ধকারকে মেনে নেননি। আজকের এই চাঁদ অন্ধকারকে অগ্রাহ্য করে হারানো মধুকরের খোঁজে কলকাতার কুম্ভীপাকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। কাহিনীতে রমানাথ হয়তো অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেননি। তিনি প্রতীকীভাবে মেছোবাজারের পাঁচতলা বাড়ির তিনতলা পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁর এই অভিযান ব্যর্থ হয়নি। অন্বেষণের মধ্যে দিয়ে তিনি এক নতুন মূল্যবোধে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই সমালোচক জহর সেনমজুমার সার্থকভাবেই বলেন—

> ''প্রত্যক্ষভাবে প্রতিবাদী না হয়েও আসলে ভেতরে-ভেতরে একটা চলমান প্রতিবাদের সম্ভাবনা সমস্ত আখ্যান জুড়ে রমানাথের মাধ্যমে সবসময় প্রতিফলিত হয়েছে। ... স্বপ্নে সংবেদনশীল রমানাথ দেখিয়েছেন আমাদের জীবন কীভাবে অতীত থেকে লোকায়ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে দ্রুত সত্যচ্যুত হয়ে পড়ছে। যা আমাদের অতীত, যা আমাদের অর্ন্তবর্তী প্রবহমান ক্রিয়ার মূল শিকড়— তা কি কখনো শেষ হয়ে যায়? যেতে পারে? রমানাথ বুঝেছেন সেই প্রবহমানতা।''[৩১]

এইভাবে সত্যপ্রিয় ঘোষ স্বাধীনতা-উত্তর পর্বের মানুষের অন্তর্জগৎটিকে প্রাগাধুনিক সাহিত্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করে তৈরি করেন আর এক নতুন শিল্প। এইভাবেই মনসাকথার মিথকে নিয়ে তিনি এক নতুন উপন্যাস গড়ে তোলেন।

চাঁদসদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র মনসামঙ্গল কাব্যের লখিন্দর চরিত্রকে কেন্দ্র করে রচিত **অভিজিৎ সেনের 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর'** (১৯৯৫ খ্রী:) উপন্যাসটি পেয়ে থাকি। অধূনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলার কেওড়া গ্রামে জন্ম আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ সেনের (১৯৪৫ সালের ২৮ শে জানুয়ারি)। একসময় নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এই সাহিত্যিকই সমবায় ও গ্রামীণ ব্যাঙ্কের (প্রায় ৩৪ বছর) চাকরির সূত্রে উত্তরবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলায় ব্যাপক ঘোরাফেরা করেন। এইভাবে গ্রাম বাংলার সমাজ অর্থনীতির সঙ্গে গভীর পরিচয় হয়। এই সমস্ত এলাকার লোকের শুধু বাড়ি নয়, হাড়ির খবরও জানতেন তিনি। সেই সমস্ত মানুষের আচার, অর্থনৈতিক ও আর্থসামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন তিনি। সরেজমিনে থেকে প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যেকটা জিনিসকে তিনি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর এই উপলব্ধির পরিচয় পাই বিভিন্ন রচনায় ঘটনার মধ্য দিয়ে। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে বারে বারে উঠে এসেছে এই প্রত্যক্ষ দর্শন ও ঘটনাবলী। আলোচ্য 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' -উপন্যাসেও আমরা বাস্তব জীবনের পরিচয় পাই। অভিজিৎ সেনের প্রধান প্রধান উপন্যাসগুলি হল—

১. 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর'

২. 'রহু চণ্ডালের হাড়'

৩. 'অন্ধকারের নদী'

৪. 'দেবাংশী'

৫. 'আঁধার মহিষ'

৬. 'ছায়ার পাখি' ইত্যাদি।

মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের মনসাকথার মিথকে অতি সন্তর্পণে উপন্যাসের মধ্যে ঢুকিয়ে আধুনিক জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। উপন্যাসে এক রোম্যান্টিক প্রেম কাহিনী রয়েছে এবং তাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য ঘটনাগুলি উঠে এসেছে সচেতনভাবে। উপন্যাসের নায়ক চব্বিশ বছরের সুদর্শন যুবক বালা লখিন্দর, মুসিধাপের নামকরা ব্যক্তি এবং দশখানা তাঁতের মালিক তার বাবা রাজকিশোর দাস এবং মা মায়নোমতী দাসী— তিনজনের সুখী সংসার। সেই সঙ্গে আসে বিদ্যাধরী পরিবারের করুণ চিত্র এবং ঘটনাচক্রে এলুয়ার গুণমান কবিরাজের বাড়িতে বিদ্যাধরীর বসবাসের কাহিনী। উপন্যাসের শুরু হয়েছে মায়নোমতি ও রাজকিশোরের নালিশকে কেন্দ্র করে মুসিধাপের পঞ্চায়েতে বিচার সভা নিয়ে। ... মোট ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটি পঞ্চায়েতের

মধ্য দিয়ে শুরু এবং শেষও হয়েছে পঞ্চায়েতের সভা শেষ হওয়ার মধ্য দিয়ে। এর মধ্যে ঔপন্যাসিক নিজে এবং বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পূর্ব ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। রাজকিশোর ঘোষের একমাত্র পুত্রসন্তান চব্বিশ বছরের জোয়ান বুঝনদার ছেলে বালা লখিন্দর। সমুদ্রগড় মহাজনের বাড়ি থেকে সূতো ও সিল্কের দাদন এবং অনেক সময় টাকাও নিয়ে আসে সে। হিসেব রাখার মতো, সুতো গুনার মতো, চৌকস নকশার হিসেব করার মতো স্কুলে লেখাপড়া শিখেছে সে। কারখানার দেখাশুনা, তাঁতের কঠিন নক্শা নিজের হাতেই করে এবং মাসে দু'বার করে সমুদ্রগড়ে যায় বালা। পনেরো দিন হল দাদনের মাল, প্রায় বিশ হাজার টাকার সিল্কের শাড়ি নিয়ে মহাজনের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কিন্তু সেই শাড়ি সদরে মাড়োয়ারির দোকানে বিক্রি করে, বিদ্যাধরী নামে এক মেয়েকে নিয়ে অন্যত্র গিয়ে উঠেছে। রাজকিশোর পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় তার ব্যবসার লোকসান পূরণের জন্য, সমাজের কাছে তার মান-সম্মান গিয়েছে সেটা তো আর ফিরে পাবার নয়। কিন্তু মায়নোর আক্ষেপ অন্য জায়গায়। সে তার অস্তিত্বের বিপন্নতাকে মেনে নিতে পারছিল না। চৌদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হয় মায়নোর। ছ'বছর ধরে সন্তান-সন্ততি না হওয়ায় বাঁজী বলে দুর্নাম রটে যায়। ভায়োর কালীর কাছে ধরনা দিয়েও সন্তান পায়নি সে। কিন্তু ছেলে খেতে না দিলেও, মুখে লাথি মারলেও তার পুত্র সন্তান চাই। তাই সে পরের বছর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে জলে-কাদায় ডোবায় দুক্রোশ রাস্তা দণ্ডী করে মঙ্গলার বিষহরির থানে মানত রক্ষা করে। রক্তাক্ত শরীরে বুক ছুরি দিয়ে চিরে মায়ের থানে রক্ত দেয় সে। বালা লখিন্দর সেই মানতের ছেলে। সেই ছেলে এখন কূলকিনারাহীন, সমাজ ভ্রষ্টা এক ডাইনী মেয়েকে নিয়ে ঘর করবে, সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। এই মেয়েকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করার আর্জি জানায় পঞ্চজনের কাছে। এই ছেলে নিরুদ্দেশ হওয়াতে যতবার মায়নো ঘুমায়, দুঃস্বপ্ন দেখে সে। কখনো চীৎকার করে, কখনো বোবা কান্না কাঁদে, কখনো আবার অনর্গল কথা বলতে থাকে। রাজকিশোরের দুঃশ্চিন্তায় ঘুম আসে না। এই সময়ে এক বিপদ ঘটে। সম্পর্কে রাজকিশোরের ভাগনে মহেন্দ্র বালার তাঁতের পারডোবায় সাপ দেখে কোঁচের শলা বিদ্ধ করে তা মেরে ফেলে। এটা রাজকিশোরের বাড়িতে নিষিদ্ধ তা সে জানত না। মহেন্দ্র এই সাপকে মেরে ফেলায় বাড়িতে কি বিপর্যয় আসতে পারে তা কেউ জানে না। তাই আতঙ্ক, বিস্ময় ও হতাশা জড়ানো সুরে 'মারিস না, মারিস না' এবং 'মারনি' বলে মায়নো সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। জ্ঞান ফেরার পর দু'হাত কপালে তুলে সে বিড়বিড় করে বলতে থাকে—

> ''জয় মাও বিষহরি, জয় মা, বালাক্ রক্ষা করিস মা। তোর দেওয়া বালাক্ তুইই দেখিস মাও।''[৩২]

পঞ্চায়েতে আসার দে'ড় বছর আগে, লখিন্দর স্বপ্ন দেখে ভাদ্রের নদীর উপর ভেসে যাচ্ছে সে। ভাদ্রের নদী, কিন্তু নদীর সেই টান নেই। এই নৌকা ভাসিয়ে যেতে নদীর ঢেউ যেন পেঁজা তুলোর মতো আরামদায়ক মনে হয়। নদীর স্বপ্নের কথা শুনে মায়নো আতঙ্কিত হয়। তার সই শৈলী ছেলের বিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেয়। মনসার বরপ্রাপ্ত এবং বালা লখিন্দর নাম হওয়ায় শিশু বয়স থেকে কোনদিন বন্ধুদের সঙ্গে কলার ভেলায় চাপতে দেয়নি তাকে। কিছু দিন পরে ভাদ্র মাসের ভরা নদীতে করে বাঁশ নিয়ে আসে যোগেনের সঙ্গে, উজানে মাইল দশেক দূরে এক গ্রাম থেকে। সেখানে এলুয়ার ঘাটে মাশনা কালীর কবলে পড়ে যোগেন ও বালা লখিন্দর। কবিরাজ গুণমান মুঠি মুঠি ধুলা নদীতে ছুড়ে তুকতাক করে লখিন্দরকে বাঁচিয়েছে বলে মায়নো চাল, ডাল, তেল, সিঁদুর এবং নগদ দশ টাকা দিয়ে কবিরাজের বাড়িতে পাঠায়। আর এখানেই দেখা হয় বিদ্যাধরীর সাথে লখীন্দরের। বুড়ো কবিরাজের বাড়িতে বাইশ তেইশ বছরের সুন্দরী বউ দেখে বালার কৌতূহল হয়। ঘটনাসূত্রে জানা যায়— গুণমান কবিরাজের দুই স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যায়। নিঃসন্তান কবিরাজের সন্তান লাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটেনি। পরপর দুই স্ত্রী মারা গেলে নিজেকে অভিশপ্ত মনে করে বউ তার কপালে নেই ভেবে বন্ধু কুলকাণ্ডের কথায় 'গাও গছ' নেওয়ার কথা ভাবে। এ ব্যবস্থা সমাজে ছিল। কোন কুমারী কিংবা বিধবা গোপনে বা অন্য কোনভাবে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে প্রথম প্রচেষ্টা হত দায়ী ব্যক্তিকে খুঁজে বের করে তাদের বিয়ে দেওয়া। দায়ীকে খুঁজে না পাওয়া গেলে অথবা বাধ্য করা না গেলে অন্য উপায় খোঁজা হত। কেউ গাছ হতে রাজি হলে স্ত্রীলোকটিকে সেই গাছে লতিয়ে ওঠার ব্যবস্থার নাম 'গাও গছ' বিয়ে। কবিরাজ গুণমানকে এরকম একটি বৃক্ষ হতে বলেছিল তার বন্ধু। এই গাও গছের পত্নী ক্রমে ধর্মপত্নীর মতোই হয়, সন্তানটি নিজ সন্তানের সমতুল্যই হয়ে পড়ে। কারণ এতে ধর্ম থাকে, সমাজ সাক্ষী থাকে। বিদ্যাধরী এরকমই গাও গছ হল কবিরাজ। এই বিদ্যাধরীর পূর্ব জীবনের কথা ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন সুন্দরভাবে। পিতা বিদেশী মালাকর, মাতা বকুলবালা এবং তাকে নিয়ে ছিল তাদের তিনজনের সংসার। বিদেশী হাটে হাটে গামছা, জামা, গেঞ্জি, কমদামী শাড়ি বিক্রি করত। সুদর্শন চেহারার এই পুরুষটি স্ত্রী-সন্তানের প্রতি অমনোযোগী হওয়ায়, এবং সহজেই অন্য নারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় সংসারে চরম বিপদ ঘনিয়ে আসে। আকর্ষণীয় চেহারার জন্য নিজের পেশা, দৈনন্দিন জীবন এবং দারিদ্র্য কোন কিছুই ছাপ ফেলতে পারত না। তার মতে যেখানেই সে যায়, মেয়েমানুষের ঝামেলা তার কপালে এসে জুটে। যদিও সে মদ খেত, জুয়া খেলত তবুও তার দীর্ঘ পল্লবযুক্ত চোখ জোড়া পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যাবার অঙ্গীকার রাখত স্ত্রীলোকের কাছে। সে মোটেই সংসারী লোক ছিল না। তাই হাতে টাকা না থাকলে, স্ত্রী বা

কন্যার মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে ঝামেলার মধ্যে না থেকে নিঃশব্দে পালিয়ে যেত। বকুলবালা সারাজীবন স্বামীকে গৃহে রাখার জন্য তার মনতুষ্টির আপ্রাণ চেষ্টা করত। কিন্তু বিদেশী চাইত সেই বাঁধনের বাইরে থাকতে— খেয়ে না-খেয়ে, পরে না-পরে হা ঘরে মানুষের যেমন চলে। বকুলবালা পঁয়ত্রিশ, কি ছত্রিশ বয়স হতে না হতেই বিদেশীর কাছে তার উপযোগিতা কমে যেতে লাগল। তার সঙ্গে আবার বকুলবালার ছিল শরীরের অসুখ। দু মাস, তিনমাস সুস্থ থাকার পর আবার শরীর ফুলে উঠত, রক্তের বাঁধ ভেঙে যেত। এরকম পরিস্থিতির মধ্যে বিদেশী একদিন তার শেষ নিয়তির কবলে পড়ল। হাট থেকে ফেরার সময় দুই নারী-সরস্বতী ও সনেকার সঙ্গে দেখা হয়। সম্পর্কে তারা মাসী শাশুড়ি-ভাগ্নেবউ। এই সনেকার প্রেমে পড়ে বিদেশী। আবার সরস্বতীর সঙ্গে একটা গোপন সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যায়, তা চাপা রাখার জন্য সরস্বতীর সঙ্গে 'ধর্মবোন' সম্পর্ক পাতায় বিদেশী। তারপর ছ'মাসের মধ্যে বিদেশী, সরস্বতী এবং সনেকার মধ্যে এক বিচিত্র খেলা শুরু হয়ে গেল। কে যে কাকে ঠকাচ্ছে, কে যে জিতছে, কে যে হারছে, তার কোন হিসেব কেউ রাখতে পারল না। ধর্মবোন পাতানোর ফলে বিদেশীর বাড়িতে সরস্বতীর অবাধ যাতায়াত শুরু হয়। বিদেশীও সরস্বতীর বাড়িতে প্রায়ই যেতে থাকে। আবার মামাশ্বশুরের বাড়ি হওয়ায় সনেকাও সেখানে আসত বিদেশীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে। এক সময় এই সনেকাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয় বিদেশী এবং গর্ভবতী সনেকাকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসে। ভাগ্যের পরিহাসে শেষে সনেকার স্বামী কেদার ঘোষ ও তার ভাইদের হাতে খুন হয় বিদেশী, মুক্তরামপুরে হাজার মানুষের সামনে। একা বকুলবালা ষোলো সতেরো বছরের ভরা যুবতী মেয়ে বিদ্যাধরীকে নিয়ে রাস্তার ধারে সরকারী জমিতে বসবাস করতে থাকে, সঙ্গে সনেকাও। যদিও পরে পেটের সন্তান সহ সনকার মৃত্যু হয় বাজপড়ার শব্দে। প্রতিবছর আষাঢ় শ্রাবণ এই দুই মাসে বকুলবালা আড়াইশো করে পট আঁকত। হাটের পাইকার তার বাড়িতে এসে মাল কিনে নিয়ে যেত। খুব সুন্দর বিষহরির চিত্র নক্শা আঁকত বকুলবালা। ঝলমল করে উঠত সেই নক্সা। ঔপন্যাসিকের ভাষায় সন্দুরভাবে ফুটে উঠেছে—

> ''বিহুলা পতি নিয়ে সাগরে ভাসবে। নবসান মালাকার তার জন্য মঞ্জুস নির্মাণ করেছিল। সেই আদলে মঞ্জুসের পট। বকুলবালার মঞ্জুস পটের একেবারে মাথায় অষ্টনাগ ভূষিতা বিষহরি। সাপের বসন, সাপের ভূষণ, সাপের উপরে দেবীর আসন। মাথা ছত্র সাপের ফণা। আসনের দুই পাশে দুই হংস।''[৩৩]

কিন্তু তবুও বিদ্যা ও তার মায়ের জীবনে এই সুখ টুকুও থাকল না। ধান শুকানোর জন্য ভোরবেলায়

রাস্তা দখল করতে গেলে ট্রাকের দুইজন লোক তাকে তুলে নিয়ে যায়। পরে দশ-বারোদিন হলে মাঝরাতে গাড়ি আবার নামিয়ে দিয়ে যায় তাকে। তিনমাসের অন্তঃসত্ত্বা হলে— মা তাকে কবিরাজ গুণমানের বাড়ি নিয়ে যায় তা খালাস করার জন্য। কিন্তু কবিরাজ বিদ্যাধরী ও সন্তানের দায়িত্ব নেয়। এই কবিরাজের বাড়িতে বিদ্যাধরীর সঙ্গে দেখা লখীন্দরের। প্রথম দেখার তিন চারদিন পরে লখিন্দর পুনরায় কবিরাজের বাড়িতে আসে। ভরদুপুরে নিষিদ্ধ এক উত্তেজনা নিয়ে সন্তপর্ণে চোরের মতো আসে। ছিল ভয় ও সংকোচও। অথচ পরে মনে হয়েছিল বিদ্যা যেন তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। সবুজ পাড় ও সবুজ ডুরের নতুন কোরা শাড়ি পড়ে সেজেগুজে ছিল সে। সঙ্গে পানের রসে ঠোঁট লাল করা। আর এখান থেকেই প্রেমের সূত্রপাত হয় দু'জনের মধ্যে। এই প্রেমকে আরো গাঢ় করে তোলে বাঁশোর এর পলিয়া রাজবংশীদের 'সনেকাশোরী-বিদেশী বাউদিয়া' খণের গান এবং মুর্শিদাবাদের জামাল বারবেশিয়া পঞ্চরস আলকাপ পালা 'সনেকা-বিদেশী ডবল মার্ডার'। সনেকাশোরী বিদেশী বাউদিয়া' খনে সরস্বতী মনে অসৎ উদ্দেশ্যে নিয়ে ধর্মসম্পর্ক পাতাল বিদেশীর সঙ্গে। আবার বিদেশীও সেই একই উদ্দেশ্যে সম্পর্ক করল সরস্বতীর সঙ্গে। সরস্বতীর কোনও রাখঢাক নেই। সে চড়াগলায় গান গেয়ে দুঃখের কথা জানায় তার ধর্মভাইকে। এমন গাবুর বয়সে সে স্বামী পরিত্যক্ত। গাছের ডালে বসে কোকিল কেঁদে যায়, জানালায় পানের পুঁটুলি ছুঁড়ে দেয় অনভিপ্রেত প্রেমিক। আমি তো ফুলে ফুলে সর্ব অঙ্গ ভরিয়ে রেখেছি, প্রাণের ভাই। তুমি ভ্রমর হয়ে বস। লোকে কি বলবে, এসব কথা ভুলে যাও বিদেশী। এস আনন্দে মধু পান কর। বিদেশী বাউদিয়া বলে, মন পাগল করলে, সরস্বতী। এমন ভরা নদীতে খেলা করতে আমার ভয় লাগে। কিন্তু যে মুহূর্তে বিদেশী সনেকাকে দেখল, সে সরস্বতীর কাছে কলঙ্কভয়ের কথা তুলল। পাপ পুণ্যের কথা তুলল। সরস্বতী পাপপুণ্য, কলঙ্ককে দূরে সরিয়ে চুপি চুপি লীলার কথা বলে। বিদেশী ততদিনে সনকার প্রেমে পাগল। সে সরস্বতীকেই তার দুঃখের কথা জানাল। আগুনের দহনকালে সামনে যা পায়, পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। সনেকা পরস্ত্রী তো কী হয়েছে। সরস্বতী প্রেমিকের মন রাখতে কুটনী হয়ে সনেকাকে বিদেশীর হাতে তুলে দেয়। বিদেশীর রূপে পাগল হয়ে সনেকা শেষে ঘর ছাড়ল। গানে সনেকাশোরী ঘরছাড়া বিবাগী স্ত্রীলোক। সে বিদ্রোহীও। সে স্বামী-সংসার মানে না, সমাজের তোয়াক্কা করে না।

এইভাবে মহেন্দ্রের শোনানো সরল গল্প, বিদ্যার বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন স্মৃতির কথা এবং গানের আসরের চরিত্ররা মিলে বালা লখিন্দরের মস্তিস্কে একটা জটিল আখ্যানের জন্ম নেয়। সে তখনও পরিষ্কার বুঝতে পারেনি যে সে নিজেই এই আখ্যানের মধ্যে ধীরে ধীরে ঢুকে যাচ্ছে। কিন্তু মহেন্দ্র

তা জেনেছিল তাই লখিন্দরের ভাবভঙ্গি সম্বন্ধে তাকে সজাগ করতে লাগল। আবার জামাল রায়বেঁশিয়ার পঞ্চরসের যাত্রাপালার ভিখু, মধুমতী, কেদার ও বিদেশীর অভিনয়, তাকে মুহ্যমান করে তুলেছিল। ঔপন্যাসিকের বর্ণনার তাই পায়—

> ''তাঁর খরদৃষ্টি আর কিছুই দেখছিল না, দেখছিল শুধু শূন্য মঞ্চটুকু। সেই শূন্যমঞ্চ কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চোখে মায়ামঞ্চ হয়ে উঠেছিল। সেই মায়ামঞ্চে সে বিদ্যাধরীকে দেখল। মহেন্দ্র এসে হাত ধরে তাকে হ্যাঁচকা টান দিলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়িয়েছিল বালা লখিন্দর। সে ততক্ষণে জেনে ফেলেছে যে এই পালার কাহিনীর ভিতরে বালা লখিন্দরও ঢুকে পড়েছে। তার আর বেরিয়ে আসার উপায় নেই।''[৩৪]

এই সময় জ্বরে বিকারগ্রস্থ অবস্থায় পাঁচ-ছ'দিন কাটে তার। লখিন্দর ও বিদ্যাধরীর ভেতরে দুজনের আড়াল করার একটা নিঃশব্দ ইঙ্গিতের ভাষা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাদের তখন আর অন্তরের কথা খোঁজা সমস্যা ছিল না। বিদ্যা তবুও বিবেকের কাছে ছোট হয়ে যায়, বিবেকের কাছে ঠকাচ্ছে বলে। পাখির ছানার মতো আগলে রেখেছিল যে গুণমান তার কাছে সমস্ত গোপন করতে বিবেকে বাঁধছিল। তবে এই গুণমান মারা গেলে বিদ্যা নিরাপত্তাহীনতার কথা ভেবে লখিন্দরের সঙ্গে গৃহ ত্যাগ করে। এখানে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলি উঠে এসেছে। বালা নিজে বৈঠা হাতে নিয়ে এলুয়ার শ্বশ্মানের পাশ দিয়ে গিয়ে ওঠে চম্পাবতীপুর। পিতা-মাতার থেকে বহুদূরে বিদ্যাধরীকে নিয়ে সংসার বাঁধে এই বিবাগী লখিন্দর।

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং হাইস্কুলের মাস্টার বিষ্ণুপদ বাবু কবিরাজ গুণমানের দানপত্র বের করে সবাইকে জানান যে কবিরাজ তার ভিটে মাটি, ঘর-বাড়ি, যাবতীয় সম্পত্তি বিদ্যাধরীকে দিয়ে গিয়েছে। তবে বালা লখিন্দর ও বিদ্যাধরী দুজনেই গুণমানের সম্পত্তি নিতে অস্বীকার করে। উপন্যাসের শেষে আমরা দেখতে পাই বিদ্যাধরীকে তার বাবা মা মেনে নিলে লখীন্দর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছুক। মায়ের দুঃখ যন্ত্রণা ও হাহাকারে লখিন্দরের বুকের পাঁজরা ভেঙে গেলেও সে পা বাড়ায় প্রেমের দুঃসাধ্য যাত্রাপথে, যেখানে স্বপ্ন ও কুহক বাস্তবের থেকে অনেক বেশি বাস্তবিক। মায়নো ছেলেকে না দেখতে পেয়ে উন্মাদের মতো সামনের শূন্যতাকে হাতড়াতে হাতড়াতে আর্তনাদ করতে থাকলে বালা থমকে দাঁড়ায়, কিন্তু কোন দিকে পা বাড়াবে সে বুঝতে পারে না। উপন্যাসে উক্ত দৃশ্য উঠে এসেছে খুব সুন্দরভাবে—

> ''দরজার ফ্রেম ছাড়িয়ে লখাইয়ের দেহ। মায়ের আর্তনাদ শুনে থমকে

দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কোন রমণীর দিকে পা বাড়াবে সে? এই নির্বোধ আহম্মক পুরুষ এই মুহূর্তে কিছুই স্থির করতে পারছে না। চৌকাঠের কোন দিকে পা বাড়াবে সে।"[৩৫]

তারপর দৃষ্টি মায়ের দিকে থাকলেও পা তার দরজার বাইরে। একটু সময় কষ্ট করে দাঁড়িয়ে মাকে বাস্তবটা মেনে নেওয়ার কথা বলেন। তার মতে—

"মঁয় তোক দুঃখ দিয়া নিজে সুখী হবা চাঁও না। কিন্তু তোর মোর সুখ দুঃখের বাইরে আরো কিছু থাকে।"[৩৬]

এইভাবে বালা লখিন্দর ঘর ছাড়া হলেও ঘরে ফেরার আশ্বাসের মধ্য দিয়ে উপন্যাসটির সমাপ্তি ঘটেছে।

উপন্যাসটিতে পঞ্চায়েতের মীমাংসার কথা, বিদ্যাধরী ও বালা লখিন্দরের প্রেম পর্বের কাহিনী, গুণমান কবিরাজের কথা, বিদ্যাধরীর পূর্বজীবনের কথা, বালা লখিন্দরের পূর্বজীবনের কথা— সব ঘটনাগুলিই উপন্যাসে সমান্তরালভাবে বর্ণিত হয়েছে। এরই মধ্য দিয়ে মনসা কথার মিথগুলি অতি সূক্ষ্মভাবে উঠে এসেছে।

উপন্যাসের প্রথমেই আমরা দেখি বালা লখিন্দরের মা মনসার মানত করে তাকে পেয়েছিল। তারপর যুবক হলে এই লখীন্দর নদীর স্বপ্ন দেখে। মনসামঙ্গলের লখিন্দর যেমন কলার ভেলায় গাঙ্গুরের জলে ভেসে যায়। লখিন্দর নদীতে ভেসে যাওয়ার স্বপ্ন দেখলে আতঙ্কিত হয় মা মায়নোমতি। ছোটবেলা থেকে তাই বন্ধুদের সঙ্গে কলার ভেলায় উঠতে দেয়নি মায়নো। মার ধারণা— বালার কোন বিপদ হলে বিষহরি মাতাই তাকে রক্ষা করবে। যদিও মনসার মানত করা সন্তান, তবুও একটা কোথাও যেন মিল রয়েছে। মানুষের স্মৃতিতে, সত্তায়, অস্তিত্বের গোপন অভ্যন্তরে, বিশ্বাসে, কিংবদন্তীতে ওতপ্রোত ভাবে যেন নিয়তি স্থির হয়ে আছে। লখিন্দরের বাসররাতে মৃত্যু হয় বলে মা সনকা ছেলের বিয়ে দিতে বিলম্ব করে। উপন্যাসের মায়নো ছেলের বিয়ে সহজে দিতে চায় না। যার ফলশ্রুতি হয়েছে ভয়ানক। মঙ্গলকাব্যের মনসার চক্রান্তে পাঠানো স্বর্গের অপ্সরা কামসোনা লখীন্দরের মামী কৌশল্যা রূপে দীঘির পাড়ে স্নান করতে আসে। মদনবাণে জর্জরিত লখীন্দর কৌশল্যাকে দেখে মোহিত হয় এবং আলিঙ্গন প্রার্থনা করে। কৌশল্যা স্বামী মহাবীরের প্রসঙ্গ তুলে তাকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করলে লখিন্দর জোর করে তার সঙ্গে মৈথুন লীলায় আবদ্ধ হয়। উপন্যাসে বালা লখিন্দরও রূপবতী বিদ্যাধরীর প্রেমে পড়ে এবং পরিশেষে তাকে নিয়ে দেশান্তরী হয়। মনসাকথার লখীন্দর ও বালা লখীন্দর যেন একাকার হয়ে উঠেছে।

মায়নোমতি ছেলে পাওয়ার জন্য শরীর নির্যাতনের মানত করে। দাঁত ওঠার সময় প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ে লখিন্দর। নিয়ম কানুনের মধ্যে কোন কিছুই বাকি রাখেনি মায়নো। শেষে তার একসময় মনে হয়েছিল, এই নামকরণের মধ্যেই ভয়ঙ্কর কিছু লুকিয়ে আছে। তার তখন মনে হয়েছিল বালা লখিন্দর কোন মানুষের সন্তানের নাম হওয়া উচিত নয়। তার মতে, বালা লখিন্দররা মা বাবাকে শুধু দুঃখ দিতেই আসে। দুঃখ দেয়, যন্ত্রণা দেয়, তারপর মারা যায়। তবুও তো মঙ্গলবার বিষহরির থানে মানুষ পুত্র মানত করে। সেখানে অন্ধজনে চক্ষু পায়, মায়নোমতির মত হা-পুত্রীরা পুত্র পায়। কিন্তু তার কোন শর্ত ছিল না। দেবতার সঙ্গে রেষারেষি নেই। তবে এই লখাই নাম নিয়ে বাধা-বিপত্তির কোন কারণ দেখেনি। এই বালাকে তিনি 'দুর্লভ লখাই' বলে উল্লেখ করেছেন।

বকুলবালার পটের মধ্যে বিষহরির চিত্র আঁকার মধ্যে বেহুলার বৃত্তান্ত জানা যায়। বেহুলা স্বামীকে নিয়ে সাগরে ভেসে যাচ্ছে, প্রাণ ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে। সেই সঙ্গে রয়েছে মাথায় অষ্টনাগ ভূষিতা বিষহরি।

গুণমান কবিরাজ মারা যাওয়ার পর বিদ্যাধরী যে মুহূর্তে লখীন্দরের হাত ধরে নৌকায় ভেসেছিল—এই পুরুষটিকে তখন তার দৈবপুরুষ মনে হয়েছিল। বিদ্যাধরীর তাই মনে হয়েছে—

> ''চারদিকের স্তব্ধ গভীর রাতের নদী-মধ্যকার অপরিচিত নিসর্গ বিদ্যাধরীকে কেমন বিহ্বল করে দিল। কতকাল আগে সে যেন ভেসেছিল আরেকবার? সে কত জন্ম আগে? সে কি এই মানুষের সঙ্গে? মাছ, মকর, ঘড়িয়াল, কুমির, পালে পালে শিশুমার ধেয়ে এসেছিল যে পচনধারা দেহটির লোভে, সে কি ঐ দিব্য পুরুষটির, যার মাথায় এই মুহূর্তে গাছপালা ছাড়িয়ে নক্ষত্রের গায়ে গিয়ে ঠেকছে? ভয়, হতাশা, হাজার প্রলোভন জয় করেছিল কি বিদ্যা এই পুরুষের পথ চেয়েই? জয় মা বিষহরি। আমার চাঁদের সাম্মানের কাণ্ডারী তোরই সন্তান, মা। তাকে তুই দেখিস, মা।''[৩৭]

মা বিষহরির জয়গান করতে থাকে সে। তারা গ্রামে গিয়ে ওঠে। তার নাম চম্পাবতীপুর। বালা লখিন্দরও বলে—এ যাত্রায় সে কাণ্ডারী এবং বিদ্যা তার সওয়ারি। আগের জন্মের দেনা শোধ করছে সে।

রাজকিশোর ছেলেকে দেখে মুগ্ধ হয়। ঋজু শালবল্লার মত দেহকাণ্ড তার লখাইয়ের। তার এই ছেলের সঙ্গে বেশ মানিয়েছে বিদ্যাধরীকে। দুজনে যেন বেহুলা ও লখিন্দর। তার ছেলে লখিন্দর যেন ঝড়ে বিধ্বস্ত, আক্ষেপে বিপর্যস্ত। মনসামঙ্গলের লখীন্দরের মতো আত্মসংকটে জর্জরিত এই

লখিন্দর। তবে সে নিজের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নিজের জীবন সঙ্গিনী সে নিজেই খুঁজে নেয়। সমাজের বিধি নিষেধ আচার-আচরণ সব কিছুর উর্দ্ধে বসবাস করে সে।

মনসামঙ্গল কাব্যের অনুসঙ্গকে নিয়ে এক সামাজিক সমস্যা নির্ভর গল্প তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। রাজকিশোর ও মায়নোর সংসারের সমস্যাকে কেন্দ্র করে পঞ্চায়েত সভার আহ্বান এবং তার সঙ্গে অন্যান্য চরিত্রগুলি আবর্তিত হয়েছে। সেই সঙ্গে কয়েকটি সূক্ষ্ম প্রেমকাহিনী কানাই দাস ও শৈলী, বিদেশী ও সনেকা প্রভৃতি উঠে এসেছে। অপ্রধান চত্রিগুলির মাধ্যমে, যেমন— গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অভয় ঘোষ, গুণমান কবিরাজের শিষ্য শংকর ও বৈকুণ্ঠ, গুণমানের প্রথম পক্ষের শালা নিকুঞ্জ, কুলকান্ত বাবু, রাজকিশোরের ভাগ্নে মহেন্দ্র ইত্যাদি চরিত্রগুলি নাটকে গভীর তাৎপর্য বহন করে। সব মিলিয়ে আমরা লক্ষ্য করি যে মনসামঙ্গল কাব্যের অনুষঙ্গগুলির নতুন ব্যাখ্যা উপন্যাসটিতে উঠে এসেছে। তাই উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে মনসাকথার নবরূপায়ণ।

মনসামঙ্গলের অনুষঙ্গকে ব্যবহার করে রচিত আরো কয়েকটি আধুনিক উপন্যাসের কথা জানা যায়। নিম্নে সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

'কালকূট' ছদ্মনাম ধারী লেখক সমরেশ বসু তাঁর 'উত্তরঙ্গ' (১৯৫১) উপন্যাসে নতুন আঙ্গিকে মনসামঙ্গলের কাহিনী পরিবেশন করেছেন। বেরিলির যুদ্ধে পরাজিত সিপাহী হীরালালের পুনর্জন্ম হয়, লখাই বাগদী নামে। মনসামঙ্গলের মনসার বিষকে লেখক যেন এখানে পরাধীনতার যন্ত্রণার সঙ্গে উপমিত করেছেন। উপন্যাসে অশুভশক্তির কাছে জগদ্দলের মানুষের হার স্বীকার হলেও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখরিত হয়েছে। মনসামঙ্গলের কাহিনীর মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক অস্থিরতাময়, জ্বালাযন্ত্রণাময় পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছেন, অন্যদিকে সেই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে নীরবে সংগ্রামের যে দানা বেধেঁছিল তার চিত্রও উঠে এসেছে। এইভাবেই ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু মনসামঙ্গলের নবনির্মাণ ঘটিয়েছেন। তাঁর 'সওদাগর' (১৯৫৬-৪৭) উপন্যাসটি দাঙ্গা দুর্ভিক্ষ ও দেশভাগের পটভূমিকায় রচিত হলেও পুরাণ কাহিনীর উপর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ করে এখানে মঙ্গলকাব্যের বিষয়ভাবনার পুনর্নির্মাণ করিয়েছেন। মনসামঙ্গলের চাঁদ সওদাগরের মতো উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মেঘনাদও একজন ব্যবসায়ী এবং স্ত্রী লীলা যেন মনসার মতোই আগ্রাসিনী রূপের প্রতিচ্ছবি। মনসামঙ্গলের আখ্যান ব্যবহার করে নায়কের আশা ও আশাভঙ্গের চিত্র অঙ্কন করেছেন এবং শেষে নতুন জীবন উত্থানের চিত্র তুলে ধরেছেন। এখানেই যেন ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু উপন্যাসটির সার্থক আধুনিকরণ ঘটিয়েছেন।

'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) উপন্যাসে অদ্বৈতমল্ল বর্মণ অতি সচেতনভাবে চাঁদ

সদাগরের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন, চাঁদের পুত্রবধূ বেহুলার স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে গাঙ্গুরের জলে ভেসে যাওয়া ও স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনার প্রসঙ্গ নিয়ে এনেছেন। মনসামঙ্গলের আবহ সৃষ্টি করেছেন মালোপাড়ার চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে। এখানেই ঔপন্যাসিক মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীর প্রসঙ্গ এনে উপন্যাসটিকে স্বতন্ত্র করে তুলেছেন।

দেশ বিভাগের পটভূমিতে রচিত অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসটি। তবে এই উপন্যাসে আমরা মনসামঙ্গল কাব্যের প্রভাব লক্ষ করি। উপন্যাসে ঠাকুরবাড়ির মহেন্দ্রনাথ যেন মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর এবং পুত্র মনীন্দ্রনাথের স্ত্রী সোনা হয়ে উঠেছে বেহুলা।

একইভাবে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'মুকুন্দপুরের মনসা' উপন্যাসে মনসার স্নেহময়ী লক্ষ্মীরূপ দেখানো হয়েছে।

আবার গুণময় মান্নার 'লখীন্দর দিগার' উপন্যাসে লখীন্দর এক প্রতীকি চরিত্র হিসেবে উঠে এসেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে মনসাপুরাণের লখীন্দর যেন মধ্যমণি হয়ে উঠেছে। কৃষকদের উপর যে সামন্তপ্রভুদের অত্যাচার, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। এইভাবে মনসাপুরাণের প্রসঙ্গ এনে উপন্যাসটিকে অভিনব করে তুলেছেন।

উপরিউক্ত আলোচনার নিরিখে বলা যায়, পুরাণের চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্র মারা গেলেও, সপ্তডিঙা মধুকর সমুদ্রে নিমজ্জিত হলেও সে পুনরায় পুত্র লখীন্দরের মধ্য দিয়ে নিজের সত্যনিষ্ঠা ও আদর্শকে বলীয়ান রাখতে চেয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতার গ্লানি তাকে ছেয়ে ফেলে। কড়ে আঙুলে হোক, তবুও মনসার পূজা দিতে বাধ্য হয় সে। সেলিনা হোসেনের 'চাঁদবেনে' উপন্যাসেও রয়েছে সকিনার গর্ভে লখীন্দরের জন্মের কথা। কিন্তু মনসামঙ্গলের মিথকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে দাঁড় করিয়েছেন লেখিকা। চাঁদের মতে, তাদের ভবিষ্যৎ-এর লখীন্দরকে লোহার দেয়াল দিয়ে আড়াল করতে হবে না। এই লখীন্দরের জন্ম হবে খোলা আকাশের নীচে। এই লখীন্দর অত্যাচারী ক্রুর শক্তির প্রতীক আজু মৃধার বেড়ে ওঠাকে রুখবে। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে চম্পাইগঞ্জের মাটির আমু মৃধা ও তার বংশধর। তাই বিলের জমিতে আমু মৃধা চাঁদকে শাসালে, চাঁদ প্রতিবাদ স্বরূপ মুণ্ডুকে ধড় থেকে আলাদা করে দেয়। এভাবেই সুদিন ফিরিয়ে আনতে চায় সে। সব মানুষ নিয়ে চম্পাই গঞ্জের একটাই গেরস্থানি দেখতে চায়। এখানে অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'চাঁদবেনে' উপন্যাসের সমতটের চন্দ্রশেখর বসুর সঙ্গে মিল খুঁজে পাই। চন্দ্রশেখরও নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার, অভিনব ধাতু আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে সমতটকে উন্নত নগরীতে পরিণত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। অমিয়ভূষণের চন্দ্রশেখর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তার সমতট কুম্ভকোনমের

মহাযুদ্ধে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। শেষ পর্যন্ত মাথানত না করলেও জয় ঘোষিত হয়নি চন্দ্রশেখর বসুর। পুত্রদের হারিয়ে, বাণিজ্যে বিফল হয়ে সে অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত। এই ভাবে উপন্যাস দুটিতে রচয়িতার নিজস্ব ভাবনায়, প্রকরণের দিক দিয়ে মনসাকথার আধুনিক রূপায়ণ ঘটেছে। আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি সত্যপ্রিয় ঘোষের 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' উপন্যাসের রমানাথ। চাঁদ সদাগরের মতো প্রতিপত্তিশালী হয়ে এগিয়ে যেতে চায় সে। তবে ঘটনাচক্রে সময়ের পরিবর্তনে নিয়তি তার জীবনে কঠোর আঘাত হানে। নতুনভাবে আবার জীবন শুরু করতে চাইলে শত চেষ্টাতে নিস্তার পায় না। জীবনে হাহাকার ছাড়া আর কিছুই থাকে না। মনসার অনুষঙ্গ নিয়ে, লখীন্দরকে কেন্দ্র করে রচিত অভিজিৎ সেনের 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখীন্দর' মনসামঙ্গলের লখীন্দরের থেকে অনেকটা অভিনব রূপ পেয়েছে তাঁর উপন্যাসের লখীন্দর। এইভাবে আলোচ্য উপন্যাসগুলি হয়ে উঠেছে মনসাকথার নবনির্মাণ।

তথ্যসূত্র:

১. 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডাণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, পুণর্মুদ্রণ: ২০০৬-০৭, পৃ. ১২।

২. সাক্ষাৎকার : 9th May 2013, T oronto Festival of Litereture and the Arts 2013.

৩. চাঁদবেনে, সেলিনা হোসেন, আহম্মদ পাবলিশিং হাউজ, ৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, পৃ. ১৪

৪. তদেব, পৃ. ২৬

৫. তদেব, পৃ. ৪০

৬. তদেব, পৃ. ১০৮

৭. তদেব, পৃ.১২০

৮. তদেব, পৃ. ১২৬

৯. তদেব, পৃ. ২৪

১০. তদেব, পৃ. ২৫

১১. প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর', প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, বাকপ্রতিমা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১২, পৃ. ২৯৮

১২. অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১০, পৃ.১৬৯

১৩. তদেব, পৃ. ২১৯

১৪. তদেব, পৃ. ৩১৫

১৫. তদেব, পৃ. ৩৫০

১৬. তদেব, পৃ. ৩৮৪

১৭. তদেব,পৃ. ৪৪৩

১৮. তদেব, পৃ. ৫৮২

১৯. প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য: পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা, সনৎকুমার নস্কর, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: ১৮-০৮-২০১২, পৃ. ২১১

২০. অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৩৯৫

২১. 'আখ্যানের সাতকাহন', তপোধীর ভট্টাচার্য, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ' ১৪ রমানাথ স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-জানুয়ারি-২০০৫, পৃ. ৩৩

২২. রমাপ্রসাদ নাগ : স্বতন্ত্র নির্মিত অমিয়ভূষণ সাহিত্য, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেপ, কলকাতা-৯, জানুয়ারি-২০০২, পৃ. ১৯৯

২৩. প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর, প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, বাক্‌প্রতিমা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-জুলাই ২০১২, পৃ. ২৭০-২৭৪

২৪. 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' সত্যপ্রিয় ঘোষ, প্রত্যয়, ২৪/১ বি. ক্রিকরো, কলকাতা-১৪, গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ: ৭ নভেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৮

২৫. তদেব, পৃ. ১৪

২৬. তদেব, পৃ. ২৭

২৭. তদেব, পৃ. ৪১

২৮. তদেব, পৃ. ৫৫

২৯. সত্যপ্রিয় ঘোষ : স্বপ্ন ও শিকড়ের সন্ধান', পরিকথা, সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৪, পৃ. ৩৮

৩০. তদেব, পৃ. ৬৪

৩১. তদেব, পৃ. ৩৭

৩২. ‘বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর’-অভিজিৎ সেন, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ কলিকাতা পুস্তক মালা, পৃ. ৬

৩৩. তদেব, পৃ. ৪৪-৪৫

৩৪. তদেব, পৃ. ৪৩

৩৫. তদেব, পৃ. ৯৬

৩৬. তদেব, পৃ. ৯৬

৩৭. তদেব, পৃ. ৮৮

*****